দ্বিতীয় অধ্যায়

মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসে নানা পরম্পরার ধারায় নারীচেতনার নবপাঠ : অন্বেষণ ও পর্যালোচনা

ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্তের গবেষণাধর্মী উপন্যাস 'সীতায়ন'। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে জুন, ১৯৯৬ সালে। উপন্যাসের বিষয় – ভারতীয় এক আদর্শ নারীর পাতাল প্রবেশ, যা বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রধান ঘটনা; সেই ঘটনা ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্তকে উদ্দীপ্ত করে, মনে নানান প্রশ্নের সঞ্চার করে। লঙ্কারাজ রাবণের ভগিনী সূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধের ট্রামকার্ড হয় রঘুপতি রামচন্দ্রের পত্নী অবলা সীতা। অনুমেয় ভারতের প্রথম মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাল্মীকি রামায়ণ, যা খ্রীঃ পূর্ব ১০০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে রচিত, তা থেকে ঊনবিংশ শতক অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রামায়ণের যে প্রবহমান ধারা, যেখানে রাজা রামচন্দ্র প্রজাহিতৈষী রূপে বারবার পরিগণিত, আর তাঁরই পত্নী রাজরাণী সীতাকে বারবার দিতে হয় শুচিতা হওয়ার অগ্নিপরীক্ষা। ভারতবর্ষ তথা বাঙালি জনমানসে মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির এই অবস্থান যেন চিরকালীন। দীর্ঘকাল ধরে বয়ে আসা সীতার অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ ও অপমানের পরেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ হয়ে ওঠে বাঙালির ঘরের কথা।

দীর্ঘকাল ধরে বয়ে আসা প্রজানুরঞ্জনকারী পুরুষ রামকে কেন্দ্র করে এবং ভারতীয় আদর্শ নারীকে পাতালে প্রবেশ করিয়ে যে রাম-কথা প্রচলিত ছিল, মল্লিকা সেনগুপ্ত 'সীতায়ন' রচনা করে তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। সীতার প্রতি অবিবেচক রামকে সামনে এনে পাঠককে নতুন করে ভাবালেন। প্রশ্ন তুলে দিলেন জনমানসে। বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর উপন্যাসের সীতা মুখ বুজে রাম-আয়নের মধ্য দিয়ে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিতে নয়, বরং নিজেই তার কর্মে তৈরি করে সীতায়ন। বুঝিয়ে দিতে চায়, এবার শৃঙ্খল ভেঙে পান থেকে সংস্কারের চুন খসানোর পালা।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'সীতায়ন' উপন্যাসে মূলত দুটি বিষয়ের প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমত, আর্য ও অনার্যের সংঘাত অর্থাৎ রাম ও শম্বুকের সংঘাত, দ্বিতীয়ত, সীতার সঙ্গে রাম, অগস্ত্য মুনি ও বাল্মীকির দ্বন্দ্ব, যেখানে মূলত প্রকাশ পেয়েছে নারীর অবদমনের চেষ্টা। তেরোটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে অঙ্কিত তেরোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসটি। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ

যেমন রামকথাকে আশ্রয় করে, মল্লিকা সেনগুপ্ত তেমনি পৌরাণিক সীতাকে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে পুরুষ তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে 'সীতায়ন' উপন্যাসটি লিখলেন। দুর্ভাগ্যের তমসাছন্ন জীবন যার আজন্ম জীবনসঙ্গী, যে কেবল ভাগ্যের পরিহাস নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্দরমহলে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে পরিগণিত হতে পারত, কিন্তু কালের রাম-আয়নের বেড়াজালে তার সে মুক্তি হয়নি, সেই সীতাকে বিশ শতকে উপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত দিলেন আলোর সন্ধান। বদলে দিলেন রামকথার রীতি। পদ্যে গাঁথা রামকথা ছেড়ে পাঠক পেল গদ্যে গাঁথা সীতার কথা। নবরূপে আবিষ্কৃত হলো জনকনান্দিনী সীতার মনে জমে থাকা বহুকালের স্বর। যে সীতা প্রতিনিধিত্ব করতে চায় উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা নারীজাতির।

উপন্যাসের কাহিনীর বিন্যাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, সীতায়নের কাহিনী মূল রামায়ণের সাতকাণ্ডের মধ্যে থেকে সর্বশেষ কাণ্ড অর্থাৎ 'উত্তরকাণ্ড' থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। মূল রামায়ণের সীতার সন্তানসম্ভবা হওয়ার সময় থেকে বনবাসে সীতার নির্বাসন, বাল্মীকি আশ্রমে লব-কুশের জন্ম এবং রথারোহনে বায়ুবেগে সীতার অদৃশ্য (পাতাল প্রবেশ) হয়ে যাওয়ার কাল পর্যন্ত এই বারো বছর সময় 'সীতায়ন' উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিয়াল্লিশ সর্গ থেকে সাতানব্বই সর্গের মধ্যে এই কাহিনী বর্ণিত । সুতরাং ঔপন্যাসিক মোট ছাপান্নটি সর্গ বেছে নিয়েছিলেন। যদিও উত্তরকাণ্ডের কাহিনী ছাড়াও রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডের থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সীতায়নে স্থান পেয়েছে। কেবলমাত্র 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড' থেকে ঔপন্যাসিক কোনো কাহিনী এই উপন্যাসে গ্রহণ করেননি। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ছাপান্নটি সর্গের বিষয়বস্তু এইরূপ –

উত্তরকাণ্ডের ৪২-৪৫ সর্গের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সীতা রামচন্দ্রের কাছে তপোবন দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন – "সীতা স্মিতমুখে বললেন, রাঘব, আমি পূণ্য তপোবন সকল দেখতে ইচ্ছা করি। গঙ্গাতীরে যে উগ্রতেজা ফলমুলাশী ঋষিগণ থাকেন তাঁদের তপোবনে অন্তত এক রাত্রি বাস করতে চাই।"[১]

রামচন্দ্র সীতাকে আশ্বাস দেন আগামীকালই সীতার এই ইচ্ছা পূরণ হবে। এরপর রামচন্দ্র মধ্যকক্ষায় উপবিষ্ট হয়ে সভাসদগণের প্রতি জানতে চান – প্রজাগণ শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে ঠিক কি মনোভাব পোষণ করে ? এর উত্তরে ভদ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন –

"কিদৃশ্য হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।

অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্।।

লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্।

রক্ষসাং বশমাপন্ন্যাং কথং রামো ন কুৎস্যতি।।

অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।

যথা হি করুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ততে।।

এবং বহুবিধা বাচো বদন্তী পুরবাসিনঃ।

নগরেষু চ সর্বেষ রাজঞ্জনপদেষু চ।।"[২]

অর্থাৎ, সীতা সম্ভোগজনিত সুখ রামের হৃদয়ে এতটাই প্রবল ছিল যে, রাবণ যাকে ক্রোড়ে তুলে লঙ্কায় নিয়ে গেলেন, অশোকবনে আবদ্ধ করে রাখলেন, সেই সীতাকে রামচন্দ্র কেন ঘৃণা করছেন না ? কারণ রাজা যা করেন, প্রজা তারই অনুকরণ করে। নগরে পুরবাসীরা এইরূপ বহুবিধ কথা বলছেন শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে। ভদ্রের এই জবাবে রামচন্দ্র কাতর হয়ে পড়লেন, এবং প্রিয় দুই ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠালেন। ভরত এবং শত্রুঘ্ন এসে দেখছেন, রামচন্দ্রের মুখ রাহুগ্রস্থ চন্দ্র ও সন্ধ্যাগত সূর্যের ন্যায় নিষ্প্রভ। রামচন্দ্র তাঁদের জানান সীতা সংক্রান্ত জনরবে তিনি শোকাভিভূত হয়েছেন। সেই কারণে ভরত এবং শত্রুঘ্নকে রামচন্দ্র স্পষ্টই জানিয়ে দেন – "সীতার কথা দূরে থাক, অপবাদের ভয়ে আমি নিজের জীবন এবং তোমাদের সকলকেও ত্যাগ করতে পারি। আমি শোকসাগরে পতিত হয়েছি, এর চেয়ে অধিকতর দুঃখ হতে পারে না। লক্ষ্মণ তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রের রথে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে এস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রম আছে, সেখানে কোনও নির্জন স্থানে সীতাকে শীঘ্র রেখে এস।"[৩]

এর পরবর্তী সর্গগুলিতে দেখা যায় লক্ষ্মণ বিষণ্ণমনে সীতাকে নিয়ে যাত্রা করেন এবং বাল্মীকির আশ্রমের নিকট রামের এই কঠোর নির্দেশ সীতার সম্মুখে উপস্থাপন করেন। স্বভাবতই সীতা শোকাভিভূত হয়ে ভূপতিত হন। এরপর রয়েছে বাল্মীকি আশ্রমে সীতার আশ্রয়। ৬০-৬৫ নং সর্গে আমরা পাচ্ছি লবন অসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে শত্রুঘ্ন সেনাসমেত বাল্মীকির পর্ণশালায় আশ্রয় নিয়েছেন। সেই রাত্রিতে সীতা দুই পুত্র প্রসব করলেন। এই দুই যমজ পুত্রের নাম রাখা হল যথাক্রমে কুশ-লব। এরপর রয়েছে শত্রুঘ্নের লবন অসুর বধের কাহিনি। এরপর ৭২-৭৬তম সর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে রয়েছে শম্বুকের শিরচ্ছেদের কাহিনি। রাজ্যে বালক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র রাজ্যের সকল দিক পরিদর্শন করতে লাগলেন। রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছে তিনি দেখলেন-"শৈবল পর্বতের উত্তরে এক বৃহৎ সরোবরের তীরে অধোমুখে লম্ববান হয়ে একজন তপস্বী কঠোর তপস্যা করছেন। রাম তাঁকে বললেন, সুব্রত, তুমি ধন্য।

আমি দাশরথি রাম, কৌতূহলবশে প্রশ্ন করছি – কেন এই দুষ্কর তপস্যা করছ ?... তুমি কোন্ জাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য না শূদ্র, সত্য বল।

তপস্বী অধোমস্তকে থেকেই উত্তর দিলেন, আমি সশরীরে দেবত্বলাভের নিমিত্ত তপস্যা করছি। ... মিথ্যা বলব না, আমি জাতিতে শূদ্র, নাম শম্বুক। রাম তখনই খড়্গ কোষমুক্ত ক'রে শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, দেবগণ বললেন, রাম, তুমি আমাদের প্রিয়কার্য করেছ, তোমার জন্যই এই শূদ্র স্বর্গাধিকারী হ'ল না।"[৪]

এর পরবর্তী সর্গগুলিতে রয়েছে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনি। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকির এই শিষ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামপুত্র কুশ-লবও। ঋষি বাল্মীকি তাঁর শিক্ষাপ্রদত্ত্ব রামায়ণ গান কুশ-লবকে গীত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই রামায়ণ গীত শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণগোচর হলে তিনি বালকদ্বয়ের প্রতি কৌতুহলপ্রবণ হন। এছাড়া সভাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ এই অলৌকিক মধুর গান হৃষ্টচিত্তে শুনতে লাগলেন –

"দৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ স্ম মহৌজসঃ।

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহু।।

ঊচুং পরস্পর চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।

উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ।।

জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।

বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ।।"[৫]

অর্থ্যাৎ, "উপস্থিত মুনিগণ এবং মহাতেজা নৃপতিগণ যেন চক্ষুর দ্বারা পান ক'রে বার বার দেখতে লাগলেন। তাঁরা সকলে অনন্যমনা হয়ে পরস্পরকে বললেন, এরা উভয়ে রামের সদৃশ, যেন বিম্ব হ'তে উদ্ভূত দুই প্রতিবিম্ব। যদি এরা জটাবল্কধারী না হ'ত তবে রামের সঙ্গে এই দুই গায়কের প্রভেদ আমরা বুঝতে পারতাম না।"[৬]

এরপর উপন্যাসে গৃহীত সর্বশেষ সর্গ ৯৫-৯৭ তম সর্গতে রয়েছে সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনা। যজ্ঞে আগত মুনিগণ এবং শ্রীরাম কুশ-লবের এই রামায়ণ গান শুনে বিশ্বাস করলেন এই দুই পুত্র আসলে সীতারই পুত্র। এরপর রামচন্দ্র বাল্মীকি মুনির কাছে নিবেদন পাঠালেন – সীতা যদি শুদ্ধচারিণী পাপহীনা হন তবে তিনি সকলের সামনে মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি

করুন। রজনী প্রভাত হ'লে শ্রীরামচন্দ্র সকল ঋষিগণকে আহ্বান জানালেন। সীতার এই চরম পরীক্ষা দেখার উদ্দেশ্যে কৌতূহলী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর মানুষ সমবেত হলেন। এরপর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাকে সঙ্গে করে জনসমাগমে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হলেন। সকলে সমাগত হয়েছেন দেখে সীতা কৃতঞ্জলি হয়ে বললেন – "যদি আমি রাঘব ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন।"[৭]

বৈদেহী শপথ করছেন এই সময়ে ভূতল থেকে আশ্চর্য অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হয়। এরপর "ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে মৈথিলীকে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁকে দুই বাহু দ্বারা ধারণ ক'রে সেই সিংহাসনে বসালেন। সীতা রসাতলে প্রবেশ করছেন দেখে আকাশচারিগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।"[৮]

বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস তাঁদের রচিত রামায়ণে প্রজাহিতৈষী রামচন্দ্রকে পাঠকের দরবারে নায়কোচিত মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাতে পাদপ্রদীপের সমস্ত আলোকচ্ছটা রাম চরিত্র একপ্রকার শুষে নিয়েছে। তাতে সন্তান, স্বামী অপেক্ষা প্রজাকল্যাণকর রামই সর্বাপ্রেক্ষা উজ্জ্বল। অন্যদিকে রাম-রাজত্বে থাকা স্বয়ং বাল্মীকি রামায়ণের নারী চরিত্র অর্থাৎ সীতা, স্বয়ংম্প্রভা, মিত্রা প্রমুখ চরিত্রগুলিকে পুরুষতান্ত্রিকতার বন্ধনে আবদ্ধ রেখে একপ্রকার সামাজিক শিকল পরিয়ে দিয়েছেন। রামায়ণ প্রসঙ্গে স্বয়ং ঔপন্যাসিক 'সীতায়ন এবং' প্রবন্ধে বলেছেন, "রামায়ণ সেই গ্রন্থ, যা একটা জাতিকে নারী ও শূদ্রের বশ্যতা স্বীকার করতে শিখিয়েছে। রামায়ণ পুরুষের এবং উচ্চবর্ণের পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রটি সুচারুভাবে তৈরি করে দিয়েছে। রামায়ণ এক আশ্চর্য মহাকাব্য। রামায়ণ এক অনির্বচনীয় ইতিহাস, কিন্তু সেই রামায়ণই ভারতবর্ষব্যাপী সীতা ও শম্বুকদের দুঃখের বঞ্চনার শোষণের এবং নিধনের কারণ।"[৯]

অর্থাৎ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে একদিকে অনার্যদের জীবন যন্ত্রণা, অন্যদিকে সীতাকে সর্বংসহা মাতৃরূপী সাজিয়ে আর্যতন্ত্র বা ব্রাহ্মণতন্ত্র এবং পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্যই প্রকাশ পেয়েছে। যে সীতা পিতৃতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বন্দী, সেই সীতাকে পাতিব্রত্যের মিথ্যা আবরণ থেকে বের করে ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল ধরে বয়ে আসা সীতার চোখের জল মুছে আগুন ধরালেন মনে। প্রজানুকল্যাণ রামের চোখে সীতার দুর্বিষহ জীবন, একপ্রকার পুরুষতন্ত্রের গণ্ডীতে ঘেরা নারীর জীবন যন্ত্রণাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন সীতার মধ্য দিয়ে। বিশ্বাস, ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় চাপা পড়া পদদলিত সীতার মুখে দিলেন প্রতিবাদের ভাষা। বহমান স্রোতধারায় বয়ে চলা সীতার জীবনের বাঁক ঘোরালেন। 'সীতায়ন' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সীতাকে প্রধান চরত্র রূপে পরিগণিত করে ঔপন্যাসিক একপ্রকার নারী চেতনাকেই জাগিয়ে তুললেন। এতদিনকার

রাম চরিত্র প্রসঙ্গে পাঠকের বদ্ধমূল ধারণাকে বদলে দিতে সীতাকে কাহিনির প্রধান চরিত্র করলেন 'সীতায়ন' উপন্যাসে। একপ্রকার সীতার চরিত্রেরই বিবর্তন ঘটালেন আধুনিকতার ছোঁয়ায়। পুরাণের স্বামী-অনুগত সীতা ঔপন্যাসিকের কলমে রূপান্তরিত হলেন বিশ শতকে আধুনিক ভাবনায় মোড়া প্রতিবাদী সীতাতে; যে সীতা জাগিয়ে তুললেন নারীচেতনার নবপাঠ।

ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের প্রধান নারী চরিত্র সীতা। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে মিথিলার রাজা জনক যজ্ঞভূমি চাষ করার সময় লাঙলের আঘাতে ভূমি বিদীর্ণ হয়ে সীতার জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে মিথিলার রাজসভায় শিবপ্রদত্ত ধনুক বিশ্বামিত্রের পরামর্শে ভেঙে সীতাকে জয় করে বিবাহ করেন অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র রামচন্দ্র। ভাগ্যের পরিহাসে বনবাসী সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক হরণ, রাম কর্তৃক নির্বাসন, অশ্বমেধ যজ্ঞে তার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণের সাত কাণ্ডের প্রধান বিষয়। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শেষ কাণ্ড অর্থাৎ উত্তরা কাণ্ডের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত 'সীতায়ন' উপন্যাসটি রচনা করেন। মল্লিকা সেনগুপ্ত এই উপন্যাসটি বিভক্ত করেছেন মোট তেরোটি পরিচ্ছেদে। পরিচ্ছেদগুলি যথাক্রমে –

১। 'বসন্ত বাতাসে ছিল ক্রূরতম বিবাহ বিচ্ছেদ'

২। 'রাষ্ট্রের বিন্যাস এক কৌশলী মন্ত্রণা'

৩। 'নারীর আকৃতি ছিল নিরস্ত্রীকরণ'

৪। 'পূর্বপুরুষের রক্তে অন্ধ ছিল সাম্প্রদায়িকতা'

৫। 'ভরণপোষণ নেই, তবু ভর্তা তিনি'

৬। 'অরণ্যের অধিকার শাণিত আয়ুধে'

৭। 'বর্ণাশ্রম নামে এক বিষফল ফুটেছিল বৈদিক শোণিতে'

৮। 'এই দুই সর্বশান্ত কোথায় পালাবে!'

৯। 'মানুষের অধিকার চেয়েছিল একটি অন্ত্যজ'

১০। 'বালকের শব ঘিরে ষড়যন্ত্র শুরু'

১১। 'অশ্বমেধ, শূদ্রমেধ, নারীমেধ করো'

১২। 'বধ্যভূমির দিকে চলেছেন নারী'

১৩। 'জানকী মিলিয়ে যান অলৌকিক ঝড়ে'

তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ 'বসন্ত বাতাসে ছিল ক্রূরতম বিবাহ বিচ্ছেদ' অংশের ঘটনাকাল ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন ফাল্গুন মাসের কোন একদিন প্রাতঃকাল, যেখানে এক অনার্য যুবকের ছোট্ট তরণীতে চড়ে বাল্মীকির আশ্রমের দিকে সীতা ও লক্ষণের যাত্রা। যদিও এই যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্তান সম্ভাবনা সীতা কিছুই জানেন না, জানেন না স্বামী রামচন্দ্রের দ্বারা চিরকালের জন্য নির্বাসিত হতে চলেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'রাষ্ট্রের বিন্যাস এক কৌশলী মন্ত্রণা' অংশে বাকরুদ্ধ কৌশল্যাকে রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গীকারের কথা রামকে বোঝাতে দেখি। তবে মাতৃমন যে রাষ্ট্র অপেক্ষা বাৎসল্যকেই প্রাধান্য দেয়, তা কৌশল্যাও বুঝিয়ে দেন পুত্র রামকে। রামচন্দ্রও মা কৌশল্যাকে রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার গোপন উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কৌশল্যা – বুঝে যান রামচন্দ্রের কূটনৈতিক রাজনীতিকরণের কথা। রাষ্ট্রের জন্য স্ত্রী নির্বাসন, মায়ের মুখদর্শনে অস্বীকার করার মধ্যেই বিবেচিত হয়ে যায় পুরুষ শাসিত রাষ্ট্রের কাছে নারী কেবল পাত্র হিসাবেই বিবেচিত। এই পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণ প্রীতিতে অন্ধ রামচন্দ্রকে লবণাসুর হত্যায় উদ্যত হতে দেখা যায়।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'নারীর আকূতি ছিল নিরস্ত্রীকরণ' শিরোনামে। আত্রেয়ী নামক এক আশ্রম গৃহিণীর পরিচয় পাই। সন্তান সম্ভাবনা সীতার পরিচর্যায় সে ছিল সদা সতর্ক। এই পরিচ্ছেদে রাবণ প্রসঙ্গে সীতার স্মরণীয় কথা বাল্মীকি শোনান। যেখানে প্রকাশ পেয়েছে অনার্য রাক্ষসদের আক্রমণ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্তৃক অনার্য-উৎখাত, সীতাকে নিয়ে রামের উন্মাদনা প্রভৃতি বিষয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম – 'পূর্বপুরুষের রক্তে অন্ধ ছিল সাম্প্রদায়িকতা'। খর, শম্বুক, মিত্রা প্রমুখ অনার্যদের কথা ও তাদের পারিবারিক বন্ধনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। অনার্যদের কাছে রামচন্দ্র যেখানে তিরস্কৃত, সেখানে তারা সীতার জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে সীতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। অর্থাৎ অনার্যদের মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব বোধ ছিল তা স্পষ্ট। পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'ভরণপোষণ নেই, তবু ভর্তা তিনি' শীর্ষকে দেখা যায় লবণাসুর বধের উদ্দেশ্যে যুবরাজ শত্রুঘ্ন ও সৈন্যদল আশ্রয় নেয় বাল্মীকির আশ্রমে – যে আশ্রমে সীতা নির্বাসিত হয়েছেন। সন্তান সম্ভব সীতা দুই যমজ পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেও দাদা রামচন্দ্রের নির্দেশে তাদের মুখদর্শনে শত্রুঘ্ন অপারগ। এই নির্লিপ্ততা তাকেও দংশন করেছে।

উপন্যাসের ষষ্ঠ 'অরণ্যের অধিকার শাণিত আয়ুধে' শিরোনামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে দেখা যায় নারীলোলুপ রাবণের প্রসঙ্গ এসেছে। মিত্রা ও বারুণীর সংলাপে উঠে আসে রাবণ কর্তৃক অজস্র নারীদের ধর্ষিত হওয়ার কথা এবং এই ধর্ষিত নারীদের সম্মিলিত অভিশাপই রাবণের পতনকে

ত্বরান্বিত করে। নারীকে সামনে রেখে রণকৌশলের ছক, বিনাযুদ্ধে রাবণকে কুবেরের লঙ্কাপুরী প্রদান, শম্বুক ও মিত্রার প্রণয় প্রসঙ্গ প্রভৃতি উঠে আসে এই পরিচ্ছেদে। সপ্তম পরিচ্ছেদ 'বর্ণাশ্রম নামে এক বিষফল ফুটেছিল বৈদিক শোণিতে' অংশে দেখা যায় বাল্মীকি কর্তৃক আশ্রমের শিক্ষার্থীদের বেদপাঠ, লব-কুশ প্রসঙ্গ ও লবণাসুর হত্যার ছক বর্ণিত হয়েছে। এই হত্যার প্রতিরোধ তৈরি করে শম্বুক। বাল্মীকি বা অগস্ত্য মুনির যুক্তিতে সে মাথা নত করে না। অষ্টম অর্থাৎ 'এই দুই সর্বশান্ত কোথায় পালাবে!' পরিচ্ছেদে পাই শল্য ও লোমশের মৃত্যু, যুদ্ধের রণকৌশল, মিত্রাকে নিয়ে শম্বুক ও সতর্কের দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে শম্বুকের নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি বর্ণনা রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে রথ চালিকা নারী সাবর্ণির কন্যা স্বয়ম্প্রভার পরিচয় পাই, যে উপন্যাসে একপ্রকার মায়াজাল তৈরি করে। বহুদিন অন্ধকারে থাকা সীতার চোখে এক আলোকবর্তিকা তৈরি করে স্বয়ম্প্রভা। নবম পরিচ্ছেদে 'মানুষের অধিকার চেয়েছিল একটি অন্ত্যজ' অংশে পুনরায় উঠে আসে শম্বুক ও মিত্রার প্রসঙ্গ। যে শম্বুক আর্যদের কাছে মাথা নত করে না, সেই শম্বুকই বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে মিত্রাকে বিবাহ করতে চেয়েছে। ভাগ্যের পরিহাসে মিত্রা সতর্ককে বিয়ে করলেও শম্বুক মিত্রাকে ক্ষণিক সময়ের জন্য নিজের করে নিতে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়, নিরুদ্দেশ হতে চায় মিত্রাকে নিয়ে। একদিকে তার অবৈধ মিলন, অন্যদিকে আর্যদের বিরুদ্ধে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হয়ে দেবলোক জয় করা – এই দুই নিষেধকে সে ভাঙতে চেয়েছে। কারণ, "সে চেয়েছিল একটা নিষেধকে ভাঙতে। তার যে নিষেধ ভাঙাতেই আনন্দ।"[১০] এই পরিচ্ছেদে বাল্মীকিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখা যায়। প্রথমত, তিনি সীতার মুখ নিঃসৃত রামকথা শ্লোকের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে গেঁথেছেন, দ্বিতীয়ত, সেই শ্লোকে সুর সংযোজন করে (অনুষ্টুপ ছন্দে) লব ও কুশকে কঠোর শৃঙ্খলায় বাঁধেন।

উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদ 'বালকের শব ঘিরে ষড়যন্ত্র শুরু'। সেখানে দেখা যায় নারী বা শূদ্রদের পূজার অধিকার, নারীর বেদশাস্ত্রের উপর অধিকার প্রভৃতি প্রসঙ্গ অগস্ত্য মুনির কাছে যুক্তিগত ভাবে জানতে চান সীতা। যুক্তি দিয়ে সীতা বিশ্ববারার অগ্নিহোত্র বা গার্গীর ব্রাহ্মণবাদী প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও অগস্ত্য তার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দিয়ে বিরত থেকেছেন। রাগান্বিত অগস্ত্য মুনি স্বার্থের জন্যই সীতাকেও কোন অভিশাপ দেন না। কেবল অনার্য শম্বুকের তপস্যা বিঘ্নিত করে একপ্রকার রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে রামকে তার হত্যার দায়িত্ব দেন। একাদশ পরিচ্ছেদে অর্থাৎ 'অশ্বমেধ, শূদ্রমেধ, নারীমেধ করো' স্থানে সীতাকে গর্জে উঠতে দেখি। সীতা বুঝতে পারেন, রামকে দিয়ে একেবারে সুকৌশলে ব্রাহ্মণ ঋষিরা শম্বুক হত্যার পরিকল্পনা করেন। সীতা বিনয়ী, ক্ষমাশীল। তবুও সীতাকে একপ্রকার আবদ্ধ থাকতে হয় পুরুষতন্ত্রের গণ্ডিতে। নিষেধ পড়ে উচ্চবর্ণের নারী হয়ে নিম্নবর্ণ অর্থাৎ অনার্যদের সঙ্গে সাক্ষাতে। শেষ পর্যন্ত শম্বুক হত্যা রোধ

করতে পারেন নি সীতা। রক্তের হোলিতে একপ্রকার মত্ত রাম এবং তা যে কেবল ব্রাহ্মণবাদের স্বার্থের প্রেক্ষিতে, তা অনুমান করে নেন সীতা। শুরু হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের পালা এবং তা সম্পূর্ণ করার জন্য সীতার শরণাপন্ন হয় আর্য সমাজ বা ঋষিগণ। এখানেই আরও প্রতিবাদী হয়ে উঠেন সীতা, "তিনি ইচ্ছা করলেই বিসর্জন দিতে পারবেন – এ কেমন ব্যবস্থা! এ কেমন রাষ্ট্র! আমি রানি, আমি এক নারী, আমি কোথায় ন্যায়ের জন্য যাব।"[১১] দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 'বধ্যভূমির দিকে চলেছেন নারী' শিরোনাম অংশে বৃক্ষমানবী সীতা স্বয়ম্প্রভার অলৌকিক রূপ দেখতে পান। এ হেন নারী মূর্তিতে সীতা বিস্মিত হয়ে পড়েন। কোন এক রহস্য তাড়া করে তাকে। অপরদিকে অযোধ্যার রাজগৃহে রামায়ণী গান শোনাতে শোনাতে লব-কুশের প্রবেশ। এখানেই একপ্রকার নাটকীয় চমৎকারিত্ব তৈরি হয়। রামের মধ্যে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। কৌশল্যার কথাতে রামের আর অজানা থাকে না লব-কুশ তারই সন্তান। বিদীর্ণ হয় রামের হৃদয়। মুখোমুখি হয়ে ভয় পান সীতার কাছে, সীতার নারীত্বের কাছে। এদিকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সীতার মনে লঙ্কাবিজয়ের পরবর্তী ঘটনার স্মৃতিকে উসকে দেয়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'জানকী মিলিয়ে যান অলৌকিক ঝড়ে' শিরোনামাঙ্কিত অংশে দেখি, সীতা বুঝতে পারেন রামের বীরত্ব আসলে কাপুরুষতারই নামান্তর। মুখোমুখি হন রাম ও সীতা। কালের ব্যবধানে সীতার অনুজ্জ্বল আবির্ভাবে লুণ্ঠিত হয় রামের মর্যাদা। মন থেকে নয়, কেবল অপযশ আস্ফালনের জন্য রামের সীতা-গ্রহণ সীতাকে, সীতার নারীত্বকে অপমান করা হয়। রামের পাপ শুদ্ধিকরণের জন্য সীতাকে দিতে হবে শুদ্ধতার শপথ! প্রতিবাদী হয়ে উঠেন সীতা। সীতার নারীত্ব পুরুষ তান্ত্রিকতার জাঁতাকলে পড়ে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবুও সীতা মাথা নত করেন নি রামের কাছে, ব্রাহ্মণবাদের কাছে, পুরুষতন্ত্রের কাছে, "কার কাছে শপথ করব শত্রুঘ্ন। সেই ভর্তার কাছে যিনি গর্ভবতী স্ত্রীকে গোপনে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই প্রেমাস্পদের কাছে যিনি নিজমুখে নির্বাসন সংবাদ জানানোর সাহস পাননি, লক্ষণের স্কন্ধে সেই দায় চাপিয়ে স্বয়ং কাপুরুষের মতো অন্তরালবর্তী ছিলেন! সেই স্বামীর কাছে যিনি সন্তানেরা নিরাপদে জন্ম নিল কি না সেই সংবাদমাত্রও নেননি !"[১২] স্তম্ভিত হয় রাজগৃহ। বুঝিয়ে দেন সতীত্ব একটি অস্ত্র মাত্র, যে অস্ত্র দিয়ে দমিয়ে রাখা হয় নারীদের। তার থেকে উত্তরণ চান সীতা। মুক্তি দিতে চান আর্য তথা সমগ্র নারীজাতিকে পুরুষতন্ত্রের শিকল থেকে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয়; সীতা প্রবেশ করতে থাকেন পাতালে। জাগরণ ঘটিয়ে যান নারীতন্ত্রের।

নারীবাদী লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীশক্তি জাগরণের জন্য কলম ধরেছেন। 'সীতায়ন' উপন্যাস সেই জাগরণেরই অন্যতম শরীক। উপন্যাসের শুরুতে রাম কর্তৃক সীতা নির্বাসিত হয়ে চলেছেন বাল্মীকি আশ্রমে। রাষ্ট্র কর্তব্যকারী রাম প্রজার সুখ কেবল নয়, সন্দেহাতীত ভাবে রাজমুকুটকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজের স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন ধূসর জীবনের প্রেক্ষাগৃহে।

রাজমহিষী সীতা যখন জানতে পারেন তিনি চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন, তখনই গর্জে উঠেন, গর্জে উঠে অবিবেচক ও সিংহাসন লোভী রাজা রামচন্দ্রকে, তিরস্কারে জর্জরিত করেন। যে স্বামী রাজ্যের জন্য নিজের স্ত্রীকে ভাই ভরতের হাতে তুলে দিতে পিছুপা হন না, ভুলে যেতে পারেন বনবাসের দীর্ঘকালের সহচরী সীতার সাহচর্যের কথা, তার ত্যাগের কথা – সীতার প্রতিবাদ সেখানেই। নারীর শুচিতার প্রশ্নে তিনি আঙুল তুলেছেন পুরুষের শুচিতার দিকেও। কৌশল্যাও হয়েছেন সীতামুখী। প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছেন সন্তানকে, "এক এক করে তিনশত পঞ্চাশৎ স্ত্রী সংগ্রহ করেছিলেন তোমার পিতা এই রাস্ট্রের কল্যাণের দোয়াই দিয়ে। সারাজীবন আমি দগ্ধ হয়েছি। তোমার সীতার প্রতি নিষ্ঠা দেখে আমি বিশ্বাসী হয়েছিলাম যে ক্ষত্রিয় হলেও তোমার প্রাণে স্নেহ আছে। হায়, পুত্র এ কি নিদারুণ কষাঘাত সেই ধারণার প্রতি।"[১৩]

মল্লিকা সেনগুপ্ত 'সীতায়ন' উপন্যাসে সীতাকে নারীচেতনার স্তম্ভ হিসেবে নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসে উল্লিখিত মিত্রা, কৌশল্যা এবং সীতার ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা তথা পুরুষ এবং পুরুষতন্ত্র দ্বারা অবমাননার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার চেয়েছেন সীতা। মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন – "নারীবাদ মানেই ডিভোর্স নয়, নারীবাদ মানেই দশটা ছেলের সাথে শোয়া নয়, নারীবাদ মানে লেসবিয়ানইজমও নয়, নারীবাদ মানে কখনই সন্তানের অবহেলা নয়, সমাজ ছারখার করা অনাসৃষ্টি নয়। কিন্তু নারীবাদ মানে প্রশ্ন তোলা, অবিরাম অনিঃশেষ প্রশ্ন।"[১৪]

এই প্রবন্ধের শুরুতে প্রাবন্ধিক নিজেই প্রশ্ন করেছেন 'নারী কে?' আর নারীত্বের এই সন্ধানই দেখা যায় সমগ্র 'সীতায়ন' উপন্যাস জুড়ে। উপন্যাসে সকল নারীর প্রতিভূ হয়ে একের পর এক অনিঃশেষ প্রশ্ন ছুড়ে গেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি অন্ধকার দিককে আঙ্গুল নির্দেশ করেছেন সীতার মধ্য দিয়ে। ঋষি অগস্ত্যকে সীতা প্রশ্ন করছেন – "হে মহাভাগ, শূদ্রও তো মানুষ ! তবে কেন তার ধর্মাচরণে স্বাধীনতা থাকবে না ?"[১৫]

এই প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্য জানান – "হে নারী, ধর্ম সকলের জন্য নয়, নারী যেমন পূজার অধিকার পায় না, শূদ্রও পায় না।"[১৬]

চেতনা আনে প্রশ্ন, প্রশ্ন আনে আত্মজাগরণ। গোটা উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক সীতার মুখে যে সকল প্রশ্ন বসিয়েছেন, তার পেছনে ছিল একটা চেতনাশক্তি। এই চেতনা অবশ্যই ঔপন্যাসিকের আত্মপোলব্ধি থেকেই উঠে এসেছে। একজন পৌরাণিক নারীর মুখ দিয়ে তিনি পুরুষতন্ত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন। পৌরাণিক অবলা সীতার মুখে এই সকল প্রশ্ন তার চরিত্রকে আধুনিকতার আলোয় বলিষ্ঠ করে তুলেছে। উপন্যাসে দেখা যায়, ঔপন্যাসিক শুধু

নারীর অন্তরের নবচেতনারই জন্ম দেননি, এই নবচেতনার ফলে নিজেদের অবস্থান থেকে উত্তরণের দিশাও কিছু দেখিয়েছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, লব কুশকে দ্বাদশ বৎসর একা লালন করেছেন সীতা। পুত্রদের সম্মুখে স্বামীকে নিয়ে সামান্য দুর্বলতা দেখা যায়নি তার মধ্যে। পিতার পরিচয় জানতে চাইলে সীতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন – "তোমরা আমার সন্তান, আপাতত এই পরিচয় মাত্র জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাদের।"[১৭]

সীতাই সম্ভবত মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম Single Mother-এর উদাহরণ। যিনি সেই সময়ে দাঁড়িয়েও ভরণপোষণহীন হয়ে পুত্রদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন পুরুষবিহীন হয়েও কিভাবে নিজের দায়িত্বকে পালন করা যায়। রামায়ণে যদিও এই বিষয়টির উপর খুব বেশি আলোকপাত করা হয়নি। কারণ পুরুষদের কলমে রচিত রামায়ণে রামের শৌর্য বীর্যের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে অধিক। কিন্তু মল্লিকা সেনগুপ্ত সেই চাপা পড়ে যাওয়া হলুদ ঘাসে আলো ফেললেন। নারীর দৃঢ় চিত্তকে তুলে আনলেন অবগুণ্ঠনহীন ভাবে। উপন্যাসে লেখিকা আরও একটি চরিত্রের অবতারণা করেছেন , যার নাম স্বয়ম্প্রভা বসুন্ধরা। এই স্বয়ম্প্রভা বসুন্ধরা চরিত্রের ভাবাদর্শেই সীতা হয়ে উঠেছিলেন নির্ভীক, বলিষ্ঠ , আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় একজন নারী। পৌরাণিক একজন অবগুণ্ঠিত নারীর কণ্ঠকে প্রতিবাদী করে গড়ে তুলতে একজনের অনুপ্রেরণার দরকার, যাকে প্রত্যক্ষ করে চির চরণতলাশ্রয়ী নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবেন। এই অনুপ্রেরণাকারী চরিত্রই স্বয়ম্প্রভা, যিনি সীতাকে হাত ধরে উত্তরণ করিয়েছেন পৌরাণিক অবলা নারী থেকে আধুনিক সবলা নারীতে – "সীতার চোখের সামনে এক বিস্ময়ের প্রতীক হয়ে বসে থাকেন স্বয়ম্প্রভা বসুন্ধরা আর সীতার মনে হয় নারীও তাহলে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সারাজীবন ধরে নারীর কী কী করা উচিত নয় তার যে পাঠ সীতা পেয়েছিলেন সেইগুলিই স্বয়ম্প্রভা আয়ত্ত করেছেন। তবুও তিনি একজন সম্পূর্ণ মানবী। ... যেন বহুদিন অন্ধকারে পথ চলতে চলতে সীতা সেই আলোর বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন আজ, অথচ যেন এরই প্রতীক্ষায় সমস্ত জীবন বসেছিলেন তিনি।"[১৮]

এই স্বয়ম্প্রভা চরিত্রের মধ্যে মল্লিকা সেনগুপ্তের আত্মভাবাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' প্রবন্ধে লেখিকা বলেছেন – "জৈবিকভাবে এককেজন শিশু স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মায় এইটুকুই প্রাকৃতিক সত্য। জন্মলগ্নে সে জানে না সে নারী না পুরুষ। তারপর প্রতি পদে তাকে টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে, পুতুল খেলিয়ে, রান্নাবাটি ধরিয়ে দিয়ে, বাইরে খেলা বন্ধ করে, পা ছড়িয়ে বসলে শ্বশুরবাড়ি দূরে হবে বলে , সরহলুদ মাখিয়ে সামাজিকভাবে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয়। আর সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোড অফ কন্ডাক্টের বিধিনিষেধ। ... এর বাইরে গেলেই

সে বিচ্যুত , সৃষ্টিছাড়া – মগজে হাতুড়ি পিটিয়ে এই ধারণা ঢোকানো হয়েছে কয়েক হাজার বছর ধরে।"[১৯]

যুগ যুগ ধরে এই বিধিনিষেধের দেওয়ালকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। উপন্যাসে স্বয়ম্প্রভা বসুন্ধরা সেই সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাধীন জাতিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই স্বাধীন জাতিকাই প্রভাব বিস্তার করেছে রাজকুলবধূ সীতার মননজগতে। স্বয়ম্প্রভার প্রভাবেই সীতা হয়ে উঠেছেন স্বাভিমানিনী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রতিবাদে ভাস্বর একজন আধুনিক নারী।

নারীবাদের মূলত দুটি ধারা রয়েছে, লিবারাল নারীবাদ বা First wave Feminism এবং আমূল পরিবর্তনকামী নারীবাদ বা Redical Feminism। লিবারাল নারীবাদে নারীবাদীরা মনে করেন পুরুষ তার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে সব অধিকার ভোগ করে, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সেই সকল অধিকার একজন নারীররও ভোগ করার অধিকার আছে। এই অধিকারবোধ থেকেই লিবারাল নারীবাদীরা আন্দোলন শুরু করেন। যদিও লিবারাল নারীবাদ Biological Essentialism-কে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক যে পার্থক্য রয়েছে তা তাঁরা স্বীকার করেন। অন্যদিকে র‍্যাডিকাল নারীবাদ সরাসরি পিতৃতন্ত্রকে ধ্বংস করার দাবী জানান। মল্লিকা সেনগুপ্ত মূলত লিবারাল নারীবাদে বিশ্বাসী। তাঁর একাধিক রচনায় এই লিবারাল নারীবাদের প্রভাব রয়েছে। 'সীতায়ন' উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছে, সীতা রাজতন্ত্রের অভিমুখে, রাষ্ট্রের অভিমুখে, ব্রাহ্মণবর্গের অভিমুখে নারী জাতির নানান অধিকারের দাবী জানিয়েছেন। উপন্যাসে মল্লিকা সেনগুপ্ত ভিন্ন ভিন্ন নারীদের ভিন্ন ভিন্ন জীবন সংকটকে তুলে ধরেছেন। আর এই বহুমুখী সংকটের মূলে রয়েছে পুরুষতন্ত্র। আসলে এই উপন্যাস পৌরাণিক সময়কে অতিক্রম করে আধুনিকতার আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। যার ফলে পৌরাণিক সময়ের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুনকে প্রতি পদক্ষেপে চ্যালেঞ্জ করেছেন সীতা। এই সীতাকে আধুনিক নারীর প্রতিভূ করে ঔপন্যাসিক আধুনিক দৃষ্টিকোণেই বিচার করেছেন রামায়ণের মূল কাহিনিকে। মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রবন্ধে বারবার উঠে এসেছে মার্কস ও এঞ্জেলসের প্রসঙ্গ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের কারণ হিসাবে মার্কস্ ও এঞ্জেলস বলেছেন, "The man seized the reins in the house also : the women was degraded, Enthralled as slave of man's lust, a mere instrument for breeding children."[২০] অর্থাৎ সম্পত্তির উপর পুরুষের একচ্ছত্র মালিকানা প্রতিষ্ঠার ফলে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা আবশ্যক। এই কারণেই পুরুষ নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করে, যা ধীরে ধীরে

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সৃষ্টি করে। এর মধ্য দিয়ে নারীদের উপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম হয়। সৃষ্টি হয় সংকট। 'সীতায়ন' উপন্যাসে মল্লিকা সেনগুপ্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে গড়ে ওঠা কৌশল্যা, মিত্রা, আত্রেয়ী এবং সর্বোপরি সীতার সংকটের দিকগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

অরণ্যের অধিকার থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত আদিবাসী অনার্য মানুষদের ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ্য করি, অনার্য দলনেতা শম্বুক সকল অনার্য পুরুষদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন। শুরু হয় প্রাপ্য অধিকার আদায়ের বিপ্লব। এরপর অরণ্য বিজয় করে শম্বুকের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় অযোধ্যার দিকে। কিন্তু আর্যসেনানীর হাতে একে একে প্রাণবিসর্জন দিতে হয় অনার্যবাসীদের। এই অবস্থায় ঋষি অগস্ত্য সকল জীবিত অনার্যদের অস্ত্র পরিহার করার নির্দেশ দেন। এটা বুঝিয়ে দেওয়া হয় এই সকল অনার্যবাসীর আর্যশ্রেণীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া রক্তপাতহীন আর কোনো সন্ধির জায়গা নেই। কেবলমাত্র দলনেতা শম্বুক এই বশ্যতা স্বীকারে রাজি হয় না। উপরন্তু স্বর্গস্থিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে সে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়। এমতাবস্থায় স্বর্গের দেবতাদের থেকে আশীর্বাদ লাভে একজন অনার্য পুরুষের বলীয়ান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় ব্রাহ্মণকুল রামচন্দ্রকে প্ররোচিত করে শম্বুক বধের। ব্রাহ্মণ্য আদেশ রক্ষার্থে রামচন্দ্র তপস্যারত শম্বুকের শিরচ্ছেদ করেন। রামায়ণের শম্বুকের কাহিনির এই অংশটি উপন্যাসের মূল কাহিনির উপকাহিনি হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। এই উপকাহিনির মধ্য দিয়ে মল্লিকা সেনগুপ্ত সমাজে প্রবাহমানকাল ধরে চলে আসা একটা নির্মম সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে ঘটনাবলীর মূল যে ঐক্যসূত্র বর্ণিত হয়েছে তা হলো বঞ্চনা। এই বঞ্চনারও দুটো দিক নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। প্রথম বঞ্চনার দিক, সীতার ব্যক্তিগত জীবনকেন্দ্রিক যা ব্যক্তি রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বঞ্চনা হল বর্ণ দ্বারা বর্ণের বঞ্চনা অর্থাৎ আর্য গোষ্ঠীর দ্বারা উপস্থিত সমগ্র অনার্যগোষ্ঠীর বঞ্চনা, বা বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, পুরুষশাষিত সমাজব্যবস্থা এবং আর্যগোষ্ঠীর দ্বারা রাষ্ট্রের কৌশলী সম্প্রসারণবাদ। যেখানে সবল শ্রেণীর ধূর্ত ইচ্ছাই দুর্বলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে পরিণত হয়।

মূলত মল্লিকা সেনগুপ্ত শম্বুকের উপকাহিনির এই অংশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেছেন, যা মূল রামায়ণের অংশ নয়। এই অংশে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণসমাজই ঠিক করে দিচ্ছেন চারটি বর্ণের মানুষ ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারিত কাজকে। এই চারবর্ণের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন বর্ণ হল শূদ্র, এই শূদ্রেরা বাকি তিন উচ্চবর্ণের আজীবন সেবা করবে, এই ছিল ব্রাহ্মণদের বিধান। এই বর্ণাশ্রম নিয়ে মূল রামায়ণে বাল্মীকি ও অগস্ত্যর কোনরূপ কথা

নজরে পড়ে না। কিন্তু মল্লিকা সেনগুপ্ত এই মুনিগণের পারস্পরিক কিছু কথা এই অংশে সংযোজন করেছেন – "আমরা (ব্রাহ্মণরা) ওদের থেকে উন্নত, সম্পন্ন , বলীয়ান কারণ আমরা ওদের যে কোনও মুহূর্তে বিনাশ করতে সক্ষম। ওদের ভয় মৃত্যুভয়, খাদ্য না পাওয়ার ভয়, ওরা জানে না শস্যকর্ষণ না মানে যুদ্ধকৌশল। ... ব্রাহ্মণেরা মেধা প্রয়োগ করে এই জায়গায় এসেছি, মূর্খেরা রাজন্য হয়ে যুদ্ধ করতে যাবে, রাষ্ট্রের পার্থিব সমস্যায় মস্তিস্ক নিয়োগ করবে, অতিমূর্খ বৈশ্য ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সর্বাধিক সেবা করবে।... ব্রাহ্মণ যন্ত্রী, বাকিরা যন্ত্র।"[২১]

অতএব সবলেরা একদিকে দুর্বলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের তথা দুর্বল মানুষদের দুর্বল শ্রেণীভুক্ত করে রাখার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই যে সামাজিক ব্যবস্থা যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই ব্যবস্থারও দুটো রূপ দেখিয়েছেন লেখিকা। প্রথম রূপ - যা সামাজিক যা একটা তন্ত্র এবং দ্বিতীয়রূপ হল – এই ব্যবস্থা, যা মানুষকে বা বলা চলে পুরুষকে এমনভাবে প্রবাহিত করছে যা সেইসময়ের এবং বর্তমানের পরিবারগুলোর অভ্যন্তরে দৃষ্টিগোচর হয়। রাষ্ট্রে যেমন সবলশ্রেণী ও দুর্বলশ্রেণীর দ্বন্দ্ব, ঠিক তেমনি পরিবারগুলোর অভ্যন্তরে সবল আর দুর্বলের দ্বন্দ্ব। পরিবারের অভ্যন্তরে এই সবল হচ্ছেন পুরুষ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারী। এক্ষেত্রে পরিবারগুলি একেকটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার শিকার। উপকাহিনিতে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখিকা। এই উপকাহিনিতেই আরও একটি চরিত্র পাওয়া যায় , যার নাম মিত্রা। মিত্রা এই উপকাহিনির একটি বলিষ্ঠ চরিত্র এবং মল্লিকা সেনগুপ্তের সংযোজন। উপন্যাসে দেখা যায় শম্বুক ও অন্যান্য অনার্য পুরুষদের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তিনি যোগ দিয়েছেন। এককথায় মিত্রা দৃঢ় চরিত্রের এক অনার্য নারী। কিন্তু একখানি দৃঢ় চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্বামী দ্বারা রোজ ধর্ষিত হতে হচ্ছে তাকে। ক্ষমতাবান পুরুষের কাছে রোজ মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে মিত্রা। অন্যদিকে মিত্রার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ শম্বুকের কাছে মিত্রা তার যন্ত্রণার কথা জানালে শম্বুক সেইসময় মিত্রাকে জোর করে সম্ভোগ করে। যদিও কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি মিত্র, অবচেতন মনে সূক্ষ্ম সায় সেখানে ছিল। কিন্তু এখানেও সবল দ্বারা দুর্বলের সম্ভোগ হচ্ছে। সুতরাং পুরুষে পুরুষে ভেদাভেদ খুবই সামান্য। মল্লিকা সেনগুপ্ত মিত্রার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন এই ইতিহাসকে তথা বর্তমান সময়ের বাস্তবতাকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে মল্লিকা সেনগুপ্ত মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদ অনুযায়ী পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক যেমন পুঁজিবাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, তেমনি গৃহের অভ্যন্তরে সেই শ্রমিক তার স্ত্রী এবং কন্যাসন্তানকে শোষণ করছে। এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার তাগিদ সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেইসঙ্গে পুঁজিপতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ তাদের পরস্পর বিরোধী হলেও নারর ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর পুরুষ একে অন্যের

নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। Hartman তাঁর 'The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism' বইয়ে পিতৃতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেছেন – "...a set of social relations between man which have a material base, and which though hierarchical, establish or create interdependent and solidarity among men that enables them to dominate woman ... They are also united in their shared meaning of dominance over woman hierarchies 'work' at least in part because they created vested interest in the status quo . Those of the higher levels can ' buy off' those at the lower level by offering them power over those still lower . In the hierarchy of patriarchy , all men, whatever their rank in the patriarchy are brought off by being able to control at least some women... Men are dependent on each other's to maintain control over women."[২২]

সমাজমনস্ক নারী হয়ে উঠতে পুরুষের বিপরীত ধারাতেই আরোপিত হয়ে নারীত্ব সৃষ্টি হয়। এই নারীকেই সতীত্বের নাগপাশে মুড়িয়ে দমিয়ে রাখা হয়, চেপে দেওয়া হয় তার বিদ্রোহকে। নারীবাদী কবি তসলিমা নাসরিন পিতৃতন্ত্রে বন্দী সতীত্বের ধারণা প্রসঙ্গে তাঁর 'সনদপত্র' কবিতায় বলেছেন –

"সতীত্ব কাহাকে বলে?

আমি এর সংজ্ঞা চাই,

সতীত্ব কাহার নাম আমি এর রক্ত পুঁজ ঘেঁটে

ত্বক ছিঁড়ে, সুখদ মাংসের কাঁচা স্বাদ পেতে চাই।"[২৩]

সীতা সতীত্বের প্রশ্নে নিজেকে সরিয়ে ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান উগরে দিয়ে আপোষহীন হয়ে উঠেছেন, বাঁচাতে চেয়েছেন তারই মতো বন্দী আর সকল নারীকে। বিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন পাপ আর সতীত্বের ধারণাকে, বদলাতে চেয়েছেন এতদিনকার পাথরের মতো বসে থাকা মিথ্যা, যুক্তিহীন ধারণাকে।

রবীন্দ্রনাথ রামের মাহাত্ম্যকথা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর।"[২৪] অর্থাৎ বিশ শতকের শুরুতেও রামায়ণের মধ্যে কেবলই রয়ে গেছেন রামকথা, উপেক্ষিতা হয়েছেন সীতা। সেই উপেক্ষিতা সীতাকে বিশ শতকের শেষ দশকে মল্লিকা সেনগুপ্ত পুরুষের জোর পূর্বক ঘোমটা দেওয়া নারীকে ঘোমটা সরিয়ে অবগুণ্ঠনহীন নারী

অস্তিত্বকে দিশা দিতে চাইলেন। উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক উৎসর্গ করেছেন 'এই সময়ের সীতাদের'। অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্ট, মল্লিকা সেনগুপ্ত একটি উদ্দেশ্য নিয়েই উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন, যেখানে নির্ণায়িত হয়ে যায় পুরাণের সীতাকে আধুনিকতার মোড়কে উপস্থাপিত করে এক বৈপ্লবিক জাগরণ ঘটাতে। সেদিনের যে সীতাকে ব্রাহ্মণদের মনরক্ষা আর প্রজাদের মুখরক্ষার জন্য স্বামী কর্তৃক নির্বাসিত হতে হয়েছিল, নিজের জীবনকে পাতালে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়েছিল শুদ্ধতার পরিচয়, মল্লিকা সেনগুপ্তের নির্মিত আধুনিক সীতার বিদ্রোহ তার বিরুদ্ধেই। সুবোধ সরকারের 'সীতা' নামক কবিতাতেও পাই ভয়হীন সেই সোচ্চার কণ্ঠ –

"হে রাম আপনার সামনে আজ দু'হাজার সীতা এসে দাঁড়িয়েছে।

আপনি এদের প্রত্যেকের জন্য অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন ?

আপনার হাতে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল কিন্তু সেই অগ্নি কী আপনার হাতে আছে যা দিয়ে দু'হাজার সীতাকে পরীক্ষা করতে পারেন?"[২৫]

মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসটির প্রধান উদ্দেশ্যই সীতার মধ্য দিয়ে নারী জাগরণ। তাই এই উপন্যাসের রাম চরিত্রের বিরুদ্ধে কৌশল্যা, সীতা, শম্বুক, ভরত, শত্রুঘ্ন, মিত্রা প্রমুখ চরিত্র রুখে দাঁড়িয়েছেন। কেবল সীতা চরিত্রের আধুনিক রূপায়ণ নয়, ঔপন্যাসিকের স্বকীয় সৃষ্টি শম্বুক ও মিত্রার উপকাহিনির মধ্য দিয়ে অনার্য জাতিরও বেঁচে থাকার বীজমন্ত্র উত্থাপন করেছেন। মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন একটি সচেতনতা, যেখানে থাকবে না ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ, থাকবে না নারী-পুরুষের মাঝে মনুষত্বের ব্যবধান।

মধ্যযুগের প্রবল ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধর্মীয় ঘেরাটোপে আবদ্ধ থেকেও মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সীতার মুখেই রামকাহিনির উপস্থাপনা পাঠকের সামনে সীতাকে নবরূপায়নে প্রথম রূপায়িত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা'(১৮৬০ খ্রীঃ) কাব্যে পুরাণের শকুন্তলা, তারা, কেকয়ী, জনা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন নবজাগরণ। আর ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'সীতায়ন' উপন্যাসে নারীদের আত্মসচেতন হওয়ার বার্তা দিয়েছেন, যে বার্তাতে শোনা যায় প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের সীতাকে দণ্ডকারণ্যে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলতে। সেই সীতা মল্লিকা সেনগুপ্তের কলমে আরও আধুনিক, আরও প্রতিবাদী, আরও যৌক্তিক।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় মল্লিকা সেনগুপ্তের দ্বিতীয় উপন্যাস 'শ্লীলতাহানির পরে'। উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন তাঁর ভাই পার্থ সেনগুপ্তকে। নারীবাদী এই লেখিকার লেখনীতে যে

নারীবাদ প্রসঙ্গই প্রবলভাবে ধরা দেবে 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসটি তার অন্যতম সার্থক উদাহরণ বলা যেতে পারে। এগারোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটির পটভূমি নগর কলকাতা, যেখানে বিশ্লেষিত হয়েছে জটিল মনস্তত্ত্ব, নারীর সামাজিক অবস্থান, নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য এবং রাজনীতি।

একটি যৌন অপরাধ ও রাজনৈতিক পটভূমিকাকে সামনে রেখে উপন্যাসটি এগিয়েছে। পুরুলিয়ার নিম্নবিত্ত সমাজের নারী মালতী মুদির উপর নির্যাতন ও শাস্তির দাবি নিয়ে নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সংগ্রামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মন্দিরার প্রতিবাদ উপন্যাসটির মূল বিষয়। ঘটনা পরম্পরায় মীনাক্ষী, ব্রতীন, রিকি, শুভেচ্ছা, সংলাপ প্রমুখ চরিত্রগুলি এসে পড়ে এবং মন্দিরার সাথে সম্পৃক্ত এই চরিত্রগুলি উপন্যাস কাহিনির কায়া নির্মাণ করে। উপন্যাসটিতে মূলত দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে। যার একদিকে রয়েছে মালতী মুদি, অন্যদিকে রিকি সেন। উপন্যাসপাঠের প্রথম দিকে মালতীকে কেন্দ্র করে যে মর্মস্পর্শী ঘটনা প্রবাহিত হতে শুরু করে তা যেন নিমেষে ঢাকা পড়ে যায় উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই। এই পরিচ্ছেদেই এসে পড়ে মন্দিরার মনস্তত্ত্ববোধ এবং রিকি প্রসঙ্গ – যে প্রসঙ্গ উপন্যাসের পরবর্তী অংশ সম্পূর্ণ রূপে কাহিনি নির্মাণ করে।

"যৌন অপরাধীর শাস্তি চাই"[২৬]– এই শ্লোগান উপন্যাসের শুরুতেই ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক কর্মী মন্দিরা রায়, স্বামী বিজন রায়, মন্দিরার বন্ধু শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছার স্বামী সংলাপ, মীনাক্ষী ও রিকি দুই যমজ বোন, মীনাক্ষীর স্বামী ব্রতীন এবং সাংবাদিক রাজকুমার প্রমুখ মুখ্য চরিত্রের সমাবেশ। দুটি ঘটনা। প্রথম ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু নার্সিংহোমের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পুরুলিয়া নিবাসী মালতীদি এবং নার্সিংহোমের মালিক। দ্বিতীয় ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে রিকি এবং মন্দিরার স্বামী বিজন রায়, যিনি বহুজাতিক সংস্থার কর্মী, প্রভাবশালী ব্যক্তি। অথচ এই দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র দেখা যায় মন্দিরা চরিত্রটির মধ্যে। মন্দিরা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির রাজনৈতিক কর্মী। সেই ভাবমূর্তিকে মানুষের সামনে তুলে আনার জন্য মালতী মুদির উপর নার্সিংহোমের মালিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্ল্যাকার্ড ধরে, প্রতিবাদ করে জনসমক্ষে। ধরা পড়ে অপরাধী, আর প্রভাবজোরে জামিনও পেয়ে যায়। এ যেন বর্তমান বিচারব্যবস্থার প্রতিও লেখিকার প্রতিবাদ। সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে মালতী মুদি, পুরস্কার পায়, তবে বিচার থেকে যায় অধরা। নীরবে নিভৃতে কাঁদতে থাকে বিচারের বাণী। একঘরে হয়ে থাকে মালতী মুদিরা। আড়ালেই থেকে যায় চিরকালের মতো।

অন্যায়ের প্রতিবাদ কারো কারো কাছে 'ফায়দা' হয়ে ওঠে। মালতী মুদির হয়ে মন্দিরার এ হেন প্রতিবাদ ফায়দা হিসাবেই দেখে স্বামী বিজন। নৈতিকতাহীন বিজন স্ত্রী মন্দিরাকে সবসময় কাছে না পাওয়ার যে স্যাক্রিফাইস তা উসুল করতে চায় মান্দিরারই প্রভাব খাটিয়ে, যেখানে মানুষের থেকেও বড় হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া। বাইরের সৌন্দর্যই যার কাছে শ্রেষ্ঠ সেই বিজন রায় পরনারীর প্রতি প্রবল আকৃষ্ট। বিজনের চোখে রূপহীন মন্দিরা হাঁপিয়ে ওঠে সাংসারিক জীবনে। তাদের মধ্যে "স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাধুর্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা সহাবস্থানের অভ্যেস।"[২৭] তাদের জীবন কাটে এক অলিখিত চুক্তিতে। ঊষর দাম্পত্য জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা মন্দিরা দেখা করে বয়সে ছোট ছেলেবেলার বন্ধু শুভেচ্ছা। কথালাপে হাল্কা হয় ধূসর জীবন। ধূসর জীবন কেবল মন্দিরার নয়, শুভেচ্ছারও। মন্দিরা যা মানিয়ে নিতে পারেনি, শুভেচ্ছা তা মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়া এক নয়। আসলে মন্দিরা ও শুভেচ্ছা দু'জনেই বিবাহিতা। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান কোন নারী চায় না, তেমনি পুরুষও। যদিও জীবন মানে সীমার আবদ্ধে গণ্ডীকাটা জীবন নয়, কখনও সীমার মাঝেও অসীমের উদ্দেশ্যে যাওয়াও নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। এই অসীমতা বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং সীমটাকে আরও অটুট করে রাখা। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন – "সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি।"[২৮] এই মায়াটুকু কখনও কখনও এমনভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে, যেখানে বাস্তবতার থেকে কল্পনাকে শ্রেয় বলে মনে হয়। শুভেচ্ছা চলেছিল কল্পনার উদ্দ্যেশ্যে, আর মন্দিরা বাস্তবতার দিকে। আসলে কল্পনা যতটা উদ্দেশ্যহীন, বাস্তবতা ততটাই কঠোর। তাই উপন্যাসে মন্দিরাকে বারবার আঘাত পেতে হয়েছে। মাথা তুলে বাঁচার চেষ্টা করেও হেরে যায় স্বামীর কাছে, সমাজের কাছে।

এই হেরে যাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া মন্দিরা চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র রিকি চরিত্রও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বলাবাহুল্য, উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ ও গঠনশৈলীর বন্টনটি মল্লিকা সেনগুপ্ত তুলে দিয়েছেন রিকি চরিত্রের মধ্যে।

মীনাক্ষীর যমজ বোন রিকি। মীনাক্ষী ও রিকি যমজ বোন হলেও তারা আইডেন্টিকাল টুইন। ফলে মীনাক্ষীর সঙ্গে রিকির স্বভাবগত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাই তাদের ছোটকাকুর বন্ধু বিজন রায়, যিনি আবার রিকির বস, তিনি অফিসে রিকির আঙ্গুল চেপে ধরলে মীনাক্ষীর মতো শারীরিক প্রশ্রয় দিতে পারেনি রিকি; উপরন্তু করেছে মৌন প্রতিবাদ, "কয়েক মুহূর্ত দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়েছিল, বিজনের চোখে ছিল অজগরের সম্মোহনী দৃষ্টির মহড়া। রিকির চোখে সম্মোহিত না হওয়ার জেদ। রিকিই জিতেছিল। হাতের কাগজপত্র টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা

কথাও না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।"[২৯] কিন্তু এমন দৃঢ়চিত্তের নারী বিজনের মতো লম্পটদের যৌনতাড়নাকে আরও খুঁচিয়ে দেয়। তাই রিকিকে সম্ভোগ করার একটা প্রবল জেদ জেঁকে বসে বিজন রায়ের মধ্যে। পরিকল্পনা মতো প্রমোশনের নাম করে সকলকে চাঁদিপুর নিয়ে যায় বিজন রায়। তবে চাঁদিপুর পৌঁছনোর আগেই বিজন রায়ের অসভ্যতা শুরু হয় ট্রেন থেকে নেমে জিপে করে হোটেল ঢোকার আগেই – "এই জিপের ঝাঁকুনিতে অবধারিত ভাবেই রিকির স্তনে বিজনের কনুই অন্তত উনিশবার আটকে যায়। রিকির উরুতে ভুলক্রমে অন্তত পনেরোবার বিজন রায়ের হাত এসে পড়ে। রিকি প্রত্যেকবারই সিঁটকে যায় আর ততই যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে কনুই আর হাত।"[৩০] এরপর চলতে থাকে রিকিকে প্রলোভিত করার একের পর এক যৌন উত্তেজক কার্য। কিন্তু কোনভাবেই যখন রিকিকে বাগে আনতে পারছে না, বিজনের আহত পৌরুষ জন্তুর মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে রিকির উপর সময় বুঝে। রাতে পি.ডব্লু.ডি.-র বারান্দায় শালীনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে বিজন – "এক ঝটকায় রিকির হাত ধরে টেনে লনে শুইয়ে ফেলে বিজন।... তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমাকে চুপচাপ হজম করতে হবে। এখন যদি চিৎকার করো, সবাই বেরিয়ে এসে। গসিপ তোমার নামেই ছড়াবে।"[৩১] এখানে লক্ষণীয়, ধর্ষণকারী নারীকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে; নারীর সামাজিক অবস্থানের অবনতির দিকটি মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক অবস্থানে নিজেদের স্থান সম্পর্কে একটা স্পর্শকাতর জায়গা এই নারীদের মধ্যে অত্যাধিক মাত্রায় দেখা যায়, আর যার ফায়দা তোলে বিজনের মতো পুরুষেরা।

বিজনের নোংরা মানসিকতা যখন রিকির সমগ্র শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সংলাপ ও শুভেচ্ছা ঘটনাস্থলে এসে যাওয়ায় বিজন সেখান থেকে পালিয়ে আসে। এই পর্যায় থেকে উপন্যাস একটা অন্য গতি লাভ করে। উপন্যাসের এই অংশের পর ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন আমাদের সমাজের নগ্নতাকে, যা একজন নারীকে তার সম্মান খোয়ানোর পর-মুহূর্ত থেকেই অনবরত সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু এই নোংরা সমাজের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা কিছু ব্যতিক্রমী নারীদের মতো রিকিও গর্জে ওঠে। যত গর্জায়, ততই একলা হতে থাকে রিকি। পাশে থাকা সংলাপ ও ব্রতীন রিকির থানায় যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলে, এমনকি দিদি মীনাক্ষীও সরে যেতে থাকে। খুব স্পষ্টভাবেই রিকির সামনে উঠে আসে সমাজের চরম সত্যতা। মধ্যবিত্ত মানুষের ভীরু, আপোষকামী চেহারাগুলো উন্মুক্ত হতে থাকে রিকির সামনে। অথচ এই পাশে থাকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষেরা পেশাগতভাবে বুদ্ধিজীবী, গায়ক, অধ্যাপক বা আইনজীবী। একজন ধর্ষিতা নারী যেমন এই ঘটনা খুব সহজে মেনে নিতে পারেনা, তেমনই সেই নারীটির মধ্যে একপ্রকার Trauma কাজ করে। আর এই মানসিক ভয়কে বাড়িয়ে দিতে আমাদের সমাজ ইন্ধন যোগায়। Psychiatrist রঞ্জিতা বিশ্বাস তাঁর 'ভাষ্য-সত্য-বিজ্ঞান : যৌন আগ্রাসন প্রসঙ্গে একটি নারীবাদী

খোঁজ' প্রবন্ধে বলেছেন, "চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র ও পুলিশের পাঠক্রম এতোটা বেশিমাত্রায় পুংবাদী মানসিকতা পুষ্ট যে, এই ধরনের ঘটনায় কার্যকরী প্রমাণ সংগ্রহের রীতিনীতি শিক্ষা তো দূরস্থান, এমনকি আক্রান্ত মানুষটির সঙ্গে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতাও সেখান থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। ...আইনশাস্ত্র প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন, নৈব্যক্তিক ; যার মধ্যে এক অর্থে অন্তর্হিত হয় বিষয়ী ও বিষয়তা; একভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে আক্রান্ত বিষয়ী।"[৩২]

মল্লিকা সেনগুপ্ত খুব সচেতনভাবেই এই উপন্যাসে সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেন। যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় তা হল – শ্লীলতাহানি হওয়ার থেকেও এই শ্লীলতাহানি নিয়ে প্রতিবাদকেই সমাজে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রবলভাবে। এমনকি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির মালিকও তার ও তার কোম্পানির কথা চিন্তা করে রিকিকে মানসিক চাপ দেয়; সেই সঙ্গে প্রলোভন দেখায় কেস তুলে নেওয়ার জন্য, "... আমার কথা যদি শোনো তো পুলিশ কেসটা উইথড্র করে নাও। পুলিশ তো এমনিও কিছু করবে না। মাঝখান থেকে মিডিয়া ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোমার বদনাম বাড়াবে।"[৩৩] সুতরাং, একজন কর্মীর অন্যায়ের এই প্রতিবাদ কোম্পানির সম্মানে আঘাত হানছে বলে মনে করা হচ্ছে। এইভাবে হাজার হাজার নারীর জোরপূর্বক কণ্ঠ রোধ করে দেয় সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত মানুষেরা। সমাজের এই নির্মম লজ্জার অভিমুখে সজোরে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন একজন নারীকে আমাদের আশেপাশের মানুষেরা ঠিক কিভাবে বিচার করে।

রিকির এই প্রতিবাদে যে দু'জন মানুষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাশে ছিল তারা শুভেচ্ছা ও রাজকুমার। রাজকুমার সাংবাদিক, সেই সূত্রে রিকির প্রতিবাদকে যথাযথভাবে সংবাদপত্রে তুলে ধরেছিল; ফলস্বরূপ তাকে সাংবাদিকতার চাকরি খোয়াতে হয়। সেইসঙ্গে রাজকুমারের অফিসের উর্দ্ধতন কর্মীর মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন সমাজের কিছু কদর্য মানসিকতাকে, "কেন মশাই, ওই মেয়েটা যে সতীলক্ষ্মী আপনি জানলেন কী করে? রিকি-ফিকি কোনও ভাল মেয়ের নাম হয় নাকি!"[৩৪] অর্থাৎ নামের মধ্য দিয়ে সমাজ চরিত্র ঠিক করে দেয় ! নারীদের কথা বলা থেকে শুরু করে তাদের চলাফেরা সবটাই মেপে নেওয়া হয় পুংবাদী বাটখারায়। অপমানিত নারীর কোন সত্ত্বাই জনসমক্ষে প্রকাশ করার যেন অধিকার থাকে না। উপন্যাসে দশম পরিচ্ছেদে নিজের ভেতরকার যাবতীয় আড়ষ্টতা কাটিয়ে রিকি সেন মঞ্চে গান গাইতে উঠলে কলামন্দির একনিমিষে 'বাইজিবাড়ি' হয়ে যায়। সমাজ বুঝিয়ে দেয়, নারী ধর্ষিতা হলে তার প্রতিভাও ধর্ষিত হয়ে যায়। তখন একজন ধর্ষিতা শিল্পীর ওপর চলতে থাকে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ।

মল্লিকা সেনগুপ্ত এই উপন্যাসে খুব সচেতনভাবেই তুলে ধরেছেন সমাজের এই ক্ষতগুলি। এই হিপোক্রেসিগুলো যুগের পর যুগ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণপোকার মতো বাসা বেঁধে রয়েছে, যা তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে যাবতীয় মূল্যবোধকে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, নারীরা আর তাদের আত্মসম্মান বিকিয়ে ভাঙা দাম্পত্যকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে না। 'পেনিস এনভি' থিওরিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নারীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। আসলে নারীদের উপর হওয়া যৌনহেনস্থা নিয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি না বদল হলে সামগ্রিক বদল সম্ভব নয়। আর এ জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রতিবাদ। নারীদের অন্তরের এই চেতনাকে জাগ্রত করাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য।

উপন্যাসপাঠে মনে হয় স্বাভাবিক ছন্দোবদ্ধ জীবন নয়, বরং কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে মানসিক টানাপোড়েন, দৈহিক প্রেম, যৌনতা অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে মন্দিরা ও বিজনের সম্পর্কে কোন মধুরতা নেই, আছে কেবল স্যাক্রিফাইস আর উসুল করার মানসিকতা, আছে বিজনের সৌন্দর্যের প্রতি কেবল আকৃষ্টবোধ। তাই তারা "একটা অলিখিত চুক্তি মেনে চলে। কেউ কারও জীবনে ঢোকে নি।"[৩৫] আসলে এখানেই ফাঁক থেকে যায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, উপন্যাসের শেষেও যা জোড়া লাগে না। অন্যদিকে শুভেচ্ছা আর সংলাপের দাম্পত্যের মাঝেও রয়েছে বঞ্চনা। কিন্তু এই বঞ্চনা উপন্যাসে উঠে এসেছে অন্য আঙ্গিকে। শুভেচ্ছার সংলাপকে নিয়ে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যতখানি দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন, সংলাপ সবটাই করে। তা সত্ত্বেও এক অদৃশ্য পর্দা তাদের মধ্যে থেকে যায়। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য প্রায় প্রতিটি নারী কাঙাল। আর এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই নারীদের মনে প্রবেশ করে নিজেদের ক্ষুদ্র করে ভাববার এক জটিল প্রয়াস। শুভেচ্ছার মতো শিক্ষিত নারীও মনোজগতের এই ওঠাপড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেনি। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সংলাপ আর রিকি দিনের পর দিন একসাথে গান নিয়ে অনেকটা সময় কাটানোর ফলে তাদের দু'জনের মধ্যে এক গভীর রসায়ন সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলস্বরূপ, "তার চোখের দৃষ্টিতে এক নিবিড় ছায়া ঘনিয়ে উঠে যেন গ্রাস করে নিতে চাইছিল রিকি নামের সম্পূর্ণ মানবীটিকে। রিকি একবার কেঁপে উঠে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমন চোখ সে আগে দেখেনি।... সংলাপ রিকিকে চুম্বন করে, তপ্ত, তীব্র চুম্বন।"[৩৬] যদিও সংলাপের সেদিনের উন্মত্ততা রিকি কড়া হাতে দমিয়ে রাখতে পেরেছিল। পরবর্তী সময়ে সংলাপও রিকিকে জোর করেনি।

অপরদিকে, মীনাক্ষী ও ব্রতীনের বিবাহিত জীবন আট বছরের। এই আট বছরের দাম্পত্য জীবনে প্রথম চার বছর তারা তাদের দাম্পত্যকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রতীনের শারীরিক উদাসীনতা সম্পর্কে ফাটল ধরায়। চাঁদিপুরে শুভেচ্ছার সংলাপকে বলতে শোনা যায় – "তোমার আর আমার মধ্যে এখন কোন শরীর নেই, এক বছর, দীর্ঘ একটা বছর আমি রোজ রাতে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু তুমি আমার কাছে আসোনি।"[৩৭] উপন্যাসে লক্ষ্য করি, মীনাক্ষী শুভেচ্ছার মতো দৃঢ়চেতা নারী নয়। সে তার অবদমিত চাওয়া-পাওয়াকে নিজের মধ্যে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাই চাঁদিপুরে সমুদ্রের কিনারে অনায়াসেই বিজনের হাতে চলে আসে মীনাক্ষীর স্তন। এমনকি, রিকির শ্লীলতাহানির পরেও দোষী অভিযুক্ত বিজন রায়ের ডাকে নিজেকে সঁপে দিতেও দ্বিধা করেনি মীনাক্ষী। যেখানে সম্পর্কের থেকেও মীনাক্ষীর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে শারীরিক চাহিদা।

মনস্তত্ত্ব, প্রেম, শঠতা, হিংসা পরায়ণতা, যৌনতা প্রভৃতি যে কয়টি বিষয় উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করেছে তার প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপন্যাসের নেগেটিভ চরিত্র বিজন রায়। মালতী মুদি মামলায় গৃহসুখ স্যাক্রিফাইস করা বিজন রায় স্ত্রী মন্দিরাকে 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করে বিজনেসের সাম্রাজ্য বাড়াতে চায়। বহিঃসৌন্দর্যই যার কাছে প্রকৃত সৌন্দর্যের মাপকাঠি তার কাছে রূপটাই প্রকট হয়ে ধরা দেয়, গুণটা থেকে যায় অন্তরালে। অন্যদিকে 'কাকু' সম্পর্কিত বিজন রায়ের দৃষ্টি পড়ে মীনাক্ষীর বোন রিকির দিকে। বিজন রায়ের শ্যোন দৃষ্টি থেকে পার পায়নি রিকি। উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিজন রায়ের রিকিকে পাওয়ার জন্য চাঁদিপুর ভ্রমণ এবং জিপের ঝাঁকুনিতে ইচ্ছে করেই রিকির স্তনে কনুইয়ের আঘাত রিকির প্রতি ভালোবাসা নয়, বরং রিকির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিজন রায়ের শ্লীলতাহানির শিকার হয় রিকি সেন। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে নার্সিংহোমের মালিক কর্তৃক নিম্নবিত্ত পিছিয়ে পড়া নারী মালতী মুদির শ্লীলতাহানি এবং বিজন রায় কর্তৃক মধ্যবিত্ত সমাজের নারী রিকি সেনের শ্লীলতাহানিতে একথা স্পষ্টই বিবেচিত হয়, ক্ষমতাশীল লোলুপ পুরুষের কাছে সব নারীই সমান। নারী মানেই তাদের কাছে ভোগ্য উপকরণ। এই ভোগের শিকার মীনাক্ষীও হয়েছিল বিজন রায়ের কাছে। কিন্তু মীনাক্ষী মানিয়ে নিয়েছিল, উপভোগ করেছিল যৌনতাকে। মল্লিকা সেনগুপ্ত এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, যারা মেনে নেয় তারা বর্তমান সমাজের কাছে টিকে যায়,যারা প্রতিবাদ করে তারা হেরে যায়,হারিয়ে যায়। আসলে এ হেন জীবনচর্চার সামাজিক কাঠামোর প্রতি ঔপন্যাসিকের প্রতিবাদ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদিনী' গল্পে রাধিকা যেমন কাঙ্ক্ষিত যৌনতার তাড়নায় পালটে ফেলে মনের মানুষ, বিজন রায়ও শরীরী ক্ষুধার নেশায় বদল করে নারী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিজন রায়ের চোখে লাগা নারীরা পার পায়না তার হাতের থাবা থেকে। তবে সংলাপ ও শুভেচ্ছার মধ্যে যৌন চাহিদা থাকলেও তার মধ্যে ছিল ভালোবাসা, প্রেম। আর বিজন রায়ের যৌন চাহিদাতে ছিল give and take পলিসি। কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে নয়, নারীর ক্ষেত্রেও এই sexual gestures থাকে। মীনাক্ষীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তার কিছু নিদর্শন লক্ষ্য করি। যেমন, উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রিকিকে বলা 'ওরকম একটু-আধটু না হলে' মীনাক্ষীর ভালো না লাগার কথা। এই 'একটু-আধটু' কখন যে চরম থেকে চরমতম হয়ে জঘন্য হিংস্রতা বয়ে আনে তা মীনাক্ষীর মতো নারীরা বোঝে না। আর বোঝেনা বলেই রিকি সেনের মতো নারীরা মুখ চেপে সহ্য করে বিজন রায়দের অত্যাচার। আবার উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হোঁচট খাওয়া মীনাক্ষীর শরীরে আঘাত লাগতে দেয় না বিজন। আঘাত থেকে বাঁচানোর অছিলায় বিজন রায়ের হাত থামে মীনাক্ষীর স্তনে। চাঁদনী রাতের মায়াবী আলোয় বিজন রায় ও মীনাক্ষী পরস্পরে পায় যৌনসুখ। শরীরী নেশার কাঙাল মীনাক্ষী। আর কাঙাল বলেই ঘটনাগুলোর দরজা বন্ধ থাকে। এ মীনাক্ষীর স্বভাবজাত এবং মীনাক্ষী এমন বলেই বোন রিকিকেও মানিয়ে নেওয়ার কথা বলে। মীনাক্ষী মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু রিকি মানিয়ে নিতে পারে না। কেননা রিকি প্রতিবাদী, মীনাক্ষী চরিত্রের বিপরীত।

উপন্যাসের ঘটনাচক্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পুলিশি ব্যবস্থা বা ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার দিনের ভয়ানক থমথমে অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের প্রথমেই মালতী মুদির ঘটনায় মন্দিরার প্রতিরোধ এবং সেই প্রতিরোধের কিছুদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর দোষীদের ধরতে না পারা পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি ঔপন্যাসিকের সোজাসুজি মন্তব্য, "পুলিশের কাছে আমরা এখন আর কিছু মন্তব্য করি না । কারণ পুলিশকে কেনা যায়; আমরা জানি।"[৩৮] পাশাপাশি আবার পুলিশি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিও তীব্র ক্ষোভ জানান ঔপন্যাসিক। ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর, নির্দিষ্ট একটি দিন, যেদিন নিজস্ব দেহরক্ষীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সেদিনের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে থমথমে পরিবেশ, যে পরিবেশ উপলব্ধি করেছিল শুভেচ্ছা ও সংলাপ, শান্তিনিকেতনে। দিল্লিতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক মৃত্যুর সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে এসে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তখন সশস্ত্র যুবকের জটলা, স্তব্ধ রেল পরিষেবা, হিংস্র পশুর দল ছেয়ে ফেলে স্টেশন চত্বর। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে হয় না। মল্লিকা সেনগুপ্তের সপাটে মন্তব্য, "বড় নেতা মারা গেলে এরকম হয়।"[৩৯]

উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক নেতা অমূল্য সান্যালের পরিচয় পাই, যিনি মন্দিরার ফিলজফার ও গাইড। বিজন রায়ের কুকীর্তির সংবাদ জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমত পরিস্থিতিতে সামাল দেওয়ার জন্য দৃঢ়চেতা মন্দিরাকে সাধারণের সামনে মিথ্যে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। আসলে বর্তমানের রাজনীতিতে প্রকৃত সততার কোন মূল্য নেই। গুরুত্ব পায় কুকর্মকে চাপা দিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাজনীতি থেকে কিছু করে খাওয়ার বাসনা। এবং সেই একই পরিচ্ছেদে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেন ঔপন্যাসিক, যে ঘটনাগুলি দিল্লি থেকে পাঠানো কয়েকটা পেপার কাটিং, যেগুলো মন্দিরার চোখের সামনে ধরা যেখানে ১৯৯০ সালের ৯ই আগস্ট অপর্ণা সেন সম্পাদিত 'সানন্দা' পত্রিকায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় চিঠি, ঐ একই বছর ৩০শে মে বানতলাতে ঘটে যাওয়া ৫৩ বছর বয়সী স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী অনিতা দেওয়ানের লাঞ্ছিত ও নিহত হওয়ার ঘটনা, ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে কলকাতার পার্ক সার্কাসে বারনায়িকাকে ধর্ষণ, ফুলবাগান থানার ব্যারাকে ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, উল্লিখিত সমস্ত ঘটনার সময় ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল এবং উল্লেখযোগ্য সংযোজিত ঘটনা ৫ই মার্চ, ১৯৯৬, চাঁদিপুরে ঘটে যাওয়া মন্দিরার স্বামী বিজন রায় কর্তৃক রিকি সেনের শ্লীলতাহানি। অর্থাৎ, মন্দিরার চোখের সামনে ধরে থাকা অসুস্থ সমাজ নিমেষেই ঢেউ তুলে দেয় তার ঘরের অন্দরমহলেও।

উপন্যাসে গান একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, বাক্য যা বলতে পারে না, গান সে কথাই বলে। 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসটিতে মল্লিকা সেনগুপ্ত গানের একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। উপন্যাসটিতে মোট গান ৮টি (বেশিরভাগ গান খণ্ডিত) এবং একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সংলাপের একক কণ্ঠে চারটি, সংলাপের সঙ্গে বিজনের কণ্ঠে একটি, বিজন রায়ের সঙ্গে মীনাক্ষীর কণ্ঠে একটি, বিজন রায়ের একক কণ্ঠে একটি, আবহসঙ্গীত একটি এবং সংলাপের কণ্ঠে একটি কবিতা রয়েছে। মূলত সংলাপের কণ্ঠে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' গানটি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আঙ্গিকে দুই বার রয়েছে দ্বিতীয় ও একাদশ পরিচ্ছেদে। তবে গানের কয়েকটি চরণের মিল থাকলেও দুটি গানই ভিন্ন। অষ্টম পরিচ্ছেদে 'বোবা বালিকাটি' ও নবম পরিচ্ছেদে সংলাপের কণ্ঠে 'ওই যে বৃষ্টি' গানটি সম্পূর্ণ রয়েছে। উপন্যাসের বাকি গানগুলি কখনও এক, দুই বা চার লাইনেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং তাৎক্ষণিক সময়ের উদ্দেশ্যেই তা উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। সংলাপের কণ্ঠে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' গানটির বিশেষ সার্থকতা রয়েছে, বলা যেতে পারে উক্ত গানটিই উপন্যাসের না বলা কথা (যে কথাগুলি হয় তো রিকি সেন উচ্চকণ্ঠে বলতে পারেনি) বা উপন্যাসের

মূল ঘটনার সাংকেতিকতাকে নির্দেশ করেছে। গানটিতে 'যা পারি তা লুটে নে' চরণটিতে ঔপন্যাসিক তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আখের গোছানোকেই ইঙ্গিত করেছেন বা ভোটের নামে প্রহসন করে রাজনৈতিক নেতাদের গাড়ি, বাড়ি করে নেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আবার উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' গানটি সংলাপের কণ্ঠে গীত হয় ভিন্ন আঙ্গিকে। রিকি সেনের না বলা কথা, পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অবস্থান বা পুরুষের চোখে নারীদের স্থান কোথায় তা গানের মধ্যে তির্যক ভাবে এসেছে –

"কেউ ষোলো কেউ ষাট গো

সব মেয়ে মৌচাক গো।"[৪০]

অথবা –

"আশে পাশের মা বোনগুলো

নধর হলেই খাই গো।"[৪১]

অন্যদিকে উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে শুভেচ্ছাকে সঙ্গে নিয়ে সংলাপের 'বোবা বালিকাটি' গানটিতে যেমন কলকাতা নগরী কিভাবে বিপদনগরীতে পরিণত হচ্ছে অথবা প্রিয় শহর কিভাবে মূক ও বধির হয়ে যাচ্ছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে নবম পরিচ্ছেদে সংলাপের কণ্ঠে 'ওই যে বৃষ্টি' গানটি বুঝিয়ে দেয়, রিকি সেনের লড়াই শেষ হয়ে যায় না। রিকি সেনের লড়াই সমাজের বিরূদ্ধে, যে সমাজ তাকে উস্কে দেয় এবং বাধা দেয়। রিকি সেনের লড়াই পুরুষতন্ত্রের বিরূদ্ধে, যে পুরুষেরা নারীদের বাধ্য করে গণ্ডীকাটা জীবনের ছকে বেঁধে ফেলতে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসটিতে দুটি শ্লীলতাহানির ঘটনা পাশাপাশি দেখালেন, যদিও প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ঘটনার উদাহরণও দিয়েছেন। প্রথম ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন্দিরা চরিত্রের অবতারণা এবং তারই রেশ ধরে দ্বিতীয় ঘটনার প্রতি আলোকপাত করলেন, যার বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে রিকি সেন চরিত্র। উপন্যাসে বেশ কিছু চরিত্র কাহিনির গতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখলেও উপন্যাসে মূলত তিনটি চরিত্রই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে – মন্দিরা, বিজন রায় ও রিকি সেন। উপন্যাসের প্রথমে মালতী মুদি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠলেও পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন নি ঔপন্যাসিক। হয়তো রিকি সেন চরিত্রের রেশটুকু ছোঁয়ার জন্য প্রথম ঘটনার অবতারণা এবং যার সূত্র ধরে মন্দিরাকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ করা। উপন্যাসের সম্পূর্ণ প্লট দাঁড়িয়ে আছে যৌন হেনস্থার প্রতি। নারীদের উপর যৌন হেনস্থা নিয়ে সমাজের

দৃষ্টিভঙ্গি বদল না হলে সামগ্রিক বদল সম্ভব নয়। বিজন রায় কর্তৃক রিকি সেনের শ্লীলতাহানি এবং সে অন্যায়ের শাস্তি প্রসঙ্গে রিকি সেনের কঠোর মনোভাবকে দুর্বল করতে চেয়েছে তারই কাছের মানুষেরা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসে রমিতা কিছু পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থানায় অভিযোগ করলে শ্বশুরবাড়ি থেকেই অপমানিত হতে হয় তাকে। যেমনটা রিকি সেনকেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রভাবশালী বিজন রায়ের খবর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সংবাদমাধ্যমও। লড়াইটা কেবল রিকির। অন্যদিকে মন্দিরারও। এক ব্যক্তি, দুই নারীর মর্মভেদী যন্ত্রণা, লড়াই এবং প্রতিবাদ। মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীর অন্তরের এই প্রতিবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, পরোক্ষ বার্তা দিয়েছেন সমাজকেও। ঔপন্যাসিকের 'আম্রপালী' কবিতায় আম্রপালী যেমন পালিয়ে যেতে চায় বালিদ্বীপের খোঁজে, যাকে নষ্ট মেয়ে বলে তাড়িয়ে দিতে চায় পঞ্চায়েত, তাড়া করে সাংবাদিক, গুপ্তচর আর লোলুপ আততায়ীর দল, উপন্যাসে রিকি সেনও নারী লোলুপ পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে হাঁপিয়ে উঠে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। তবু যেন বারবার বেঁচে উঠে রিকি। চোখের সামনে উঠে আসে পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে কিভাবে মেয়েদের যৌনবস্তু হিসাবে দেখা হয়, কিসের ভয়ে চালু হয়েছিল মেয়েদের জন্য বোরখা, পর্দা ও ঘোমটার প্রচলন। প্রতিবাদ আরও জোরালো হয়। লড়াই চলতে থাকে রিকি সেনের মতো নারীদের। প্রতিবাদের ঝাঁঝে ঝলসে ওঠে বিজন রায়দের মতো পুরুষেরা। মুখ ফেরানো সমাজ রিকিমুখী হয়। সমাজের মুখোমুখির ভয়ে বিজন রায় পালাতে থাকে এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে, সমুদ্রে, বেশ্যালয়ে, শুঁড়িখানায় আসলে বিজন রায় নয় – মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর উপন্যাসে পালাতে দেখেছেন পুরুষতন্ত্রকে। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন – এই পৃথিবী নারী-পুরুষ উভয়ের। শ্লীলতাহানির পরে নারীদের কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাদের কী চোখে দেখে সমাজ, প্রতিবাদ করলে সমাজের চোখ রাঙানি এবং তা উপেক্ষা করে বুক চিতিয়ে লড়াই, অসহায় ও একাকীত্ব জীবন এবং তা থেকে পুনরায় বেঁচে ওঠা নিজের জন্য – মল্লিকা সেনগুপ্ত মূলত 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসটিতে এই দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সমাজকে বার্তা দিয়েছেন নারীকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখার। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক পুরুষতন্ত্রের প্রতি একটি সচেতন ধাক্কা দিয়েছেন।

'কবির বউঠান' মল্লিকা সেনগুপ্তের তৃতীয় তথা শেষ উপন্যাস। পূর্ববর্তী 'সীতায়ন' উপন্যাসে পৌরাণিক সীতা চরিত্রটিকে আধুনিক দৃষ্টিকোণে পাঠকের দরবারে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসে সমকালীন বাস্তব থেকে কিছু চরিত্র আহৃত করে নারী চেতনার একটি পারম্পরিক ধারা দেখানোর চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। তবে তাঁর 'কবির বউঠান' উপন্যাসটিতে নারী চেতনার এই ধারাটি সুস্পষ্ট রূপে থাকলেও ঔপন্যাসিক মূলত এই গ্রন্থে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউঠান, বহুচর্চিত কাদম্বরী দেবীর অন্তরের রহস্যময় জীবনলেখ্য

তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। এতে কেবল চরিত্রের মূল্যায়ন নয়, বরং ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নারীবাদের মনস্তাত্ত্বিকতাও তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে এবং এই নারী মনস্তাত্ত্বিকতাই উপন্যাসে অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কবির বউঠান' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় জানুয়ারি, ২০১১ সালে। উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেন 'রোগশয্যার বন্ধুদের'। মোট উনিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটির প্রতিটি পরিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বোধকরি, এই নামভিত্তিক অধ্যায় বিভাজনের প্রধান হেতু চরিত্র ও সময়কে তুলে ধরা। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশের মধ্য দিয়ে। সাল ইংরেজি ১৮৬৬, জ্ঞানদানন্দিনী প্রবেশ করলেন ঠাকুরবাড়িতে। এই প্রবেশের নাটকীয় ভঙ্গিমা ঔপন্যাসিক অত্যন্ত নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্ত উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জ্ঞানদানন্দিনী'। এই অধ্যায়ে জ্ঞানদানন্দিনীকে একপ্রকার সংস্কারহীন তেজস্বিনী নারী রূপেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ঠাকুরবাড়ির বহমান সংস্কার ছাড়িয়ে বাড়ির অন্দরমহলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর রাজকীয় প্রবেশ যেন সেই সংস্কারের মর্মমূলে চরম আঘাত হানে। শুরু হল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নারীজাগৃতির প্রথম সোপান। উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সারদাসুন্দরীর সংসার'-এ দ্বারকানাথ ঠাকুরের দুই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি বিভাজন হতে দেখা যায়। তবে ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিলেও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এরই মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ (তিরোধান– ০১.০৭.১৮৪৬, যুক্তরাজ্য) ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম মতে পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুশাস্ত্র মতে সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ফলে আরও ফাটল ধরে দুই পরিবারের মধ্যে। তবে এই দূরত্ব ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এই অধ্যায়ে বই-মালিনীর প্রবেশ বা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী নিপময়ীকে গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে গান শেখানো প্রভৃতি ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের নারী জাগৃতিকে নতুন স্রোতে বাহিত করেছিল।

উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায় 'কাদম্বরীর প্রবেশ'। ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নতুন বউঠান' কাদম্বরী দেবীর প্রথম পরিচয় দিলেন। সে সময় (১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'নবনাটক' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুরের উৎসাহে কেবল পুরুষদের দ্বারা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হচ্ছে। যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অভিনয়চর্চার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে সতর্কও করেছেন। তবে মল্লিকা সেনগুপ্ত কাদম্বরী দেবীর পরিচয়ের পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রগতিশীল ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদে মারাঠা স্টাইলের প্রতি জ্ঞানদানন্দিনীর বিশেষ অনুরাগ, তৎকালীন বোম্বাই নিবাসী আত্মারাম পাণ্ডুরঙের পরিবারের পরিচয় প্রভৃতি টুকরো টুকরো কথা লিপিবদ্ধ করেন। এরই মধ্যে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর ভারতবর্ষে প্রথম বোম্বাই-কলকাতা রেলপথ চালু হয়। এই রেলপথেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচন শুরু হয়। ঠাকুর পরিবারের আশ্রিত কর্মচারী শ্যাম গাঙ্গুলীর সেজো মেয়ে নয় বছরের কাদম্বরীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ পাকাপাকি হয়। যদিও এই প্রস্তাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তেমন সম্মতি ছিল না। অবশেষে ২৩শে আষাঢ়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হয়ে ঠাকুর বাড়িতে পা রাখেন কাদম্বরী দেবী। শুরু হয় জ্ঞানদানন্দিনী ও কাদম্বরীর মনস্তাত্ত্বিক বিরোধের এক চক্ষুশূল অধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায় 'বিরহিণী পত্রলেখা'-তে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথকতা চিঠির মাধ্যমে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন চাকুরী সূত্রে শহর এলাহাবাদে। এরই মধ্যে একাকিনী জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে প্রিয় দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে রাগ-অনুরাগ শুরু হয় কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির এই দুই পুত্রবধূর মানসিক দ্বন্দ্ব সমগ্র উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কয়েকমাস পর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পুত্রসন্তান প্রসব ও তার মৃত্যু – যা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর খবর পান ১১ই অক্টোবর জ্ঞানদানন্দিনীর ত্রয়োদশতম চিঠিতে। এর অল্পদিন পর সন্তানহারা জ্ঞানদানন্দিনী বোম্বাই যাত্রা করেন, যে যাত্রার সঙ্গী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির দুই জামাই অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল এবং সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থাৎ 'স্বর্ণকুমারীর বোম্বাইবাস' অংশে ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত তরু দত্ত বা জেন অস্টেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সাহিত্যচর্চার দিকটি তুলে ধরেন, যার কেন্দ্রে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর দশম সন্তান স্বর্ণকুমারী দেবী। এই অধ্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাদশতম সন্তান বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে দুর্গাপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম সন্তান হিরন্ময়ীর জন্ম, আঠারো বছর বয়সে কলেরায় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, দেনার দায়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সারদাদেবীর আশ্রিতা রূপকুমারীর ঘোড়ায়

পলায়ন ও তাকে ঘিরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধ্বজাধারীদের কটুকথা প্রভৃতি ঘটনা এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় 'সারদার মৃত্যু' অংশে দেখা যায় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু, পেনেটির বাগানে বেড়াতে গিয়ে সারদাদেবীর হাতে লোহার সিন্দুকের ভারি ডালা পড়ে আহত, সেখান থেকে ক্ষত এবং অবশেষে চিকিৎসক ড. নীলমাধব সরকার ও ড. প্যাট্রিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও সাময়িক মুক্তি পেলেও ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ সারদাদেবীর মৃত্যু হয়, যে মৃত্যুতে একপ্রকার ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের একটা যুগের অবসান হয়। সারদাদেবীর মৃত্যুর পর ঠাকুরবাড়ির ভার পড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর পঞ্চম সন্তান, ঠাকুর পরিবারের বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবীর উপর। সারদাদেবীর মৃত্যুতে আবার নতুন করে ঠাকুর বাড়ির সাহিত্যচর্চার নবযুগ আসে, আঙ্গিক বদলাতে থাকে ঠাকুর পরিবারের জীবনচর্চায়। সপ্তম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ 'হেকেটি ঠাকুরণ' শুরু হয়েছে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতসাম্রাজ্ঞী উপাধির সংবাদে। ঠাকুরবাড়িতে দায়িত্বভার সৌদামিনী দেবীর উপর ন্যস্ত হলেও কাদম্বরী দেবীর গুরুত্বও বাড়তে থাকে ঠাকুর পরিবারে। কিশোর মনের খুনসুটি চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর মধ্যে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন নাটক 'সরোজিনী' নাটকের প্রধান গান "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ"[৪২] রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপরই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নতুন এক পত্রিকার সূচনা করেন – 'ভারতী'। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে শ্রাবণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার প্রথমে নাম দেন 'সুপ্রভাত'। ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যচর্চার নতুন দ্বার খুললো এই পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন এবং বউঠান কাদম্বরী দেবীকে এই নাটকের তিন ডাইনির বর্ণনা করলে সেখানে হেকেটি ডাইনির খানিক চারিত্রিক মিল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদম্বরী দেবীকে 'হেকেটি ঠাকুরণ' নামকরণটি করেন। এই অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান কবীন্দ্রের জন্ম, স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোট মেয়ে ঊর্মিলার জন্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদার কলকাতায় ফিরে আসা এবং ঠাকুরবাড়ির অন্দরে জ্ঞানদানন্দিনী ও কাদম্বরী দেবীর চোখের বালির পরিণতিতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে "সাহিত্যের নির্মল বাতাসের পেছনে ঘনিয়ে ওঠে ঘনঘোর দুর্যোগ।"[৪৩] বই-মালিনীর প্রবেশের মধ্য দিয়ে অষ্টম অধ্যায় 'বটতলা বনাম ভারতী পত্রিকা' সূচিত হয়। এই বই-মালিনী ঠাকুরবাড়িতে বয়ে আনে সাহিত্যের বাতাবরণ। ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে প্রখরভাবে জাগতে থাকে সাহিত্যবোধ। বটতলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বা ইতর-ভদ্র সংস্কৃতির একটি লড়াই লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে দেখতে পাই কাদম্বরী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর একপ্রকার ঠাণ্ডা লড়াই, ঠাকুরবাড়ির আশ্রিতা রূপাকে কেন্দ্র করে সৌদামিনী ও কাদম্বরীর

দ্বন্দ্ব, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় ভারতী পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি। নবম অধ্যায়ে 'দীপনির্বাণ'-এ স্বামী জানকীনাথ স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীকে সাহিত্যচর্চা ও জীবনধারণ প্রসঙ্গে অবাধ স্বাধীনতা দেন। সন্তানদের বড় করে তোলার প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' (প্রকাশকাল-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, যা ঠাকুরবাড়ি তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহিলা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এই পরিচ্ছেদে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার জীবন'-এর রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবীর জীবনকথা এই অধ্যায়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত।

দশম অধ্যায় 'আনাবাই নলিনী' অংশে অন্তঃসত্ত্বা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে দেখা যায় বিলিতি কেতাদুরস্ত করে তুলতে সুরেন, বিবি ও চোবিকে নিয়ে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রীষ্মের এক বিকেলে লিভারপুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শৈশবসঙ্গীত' রচনা, মুম্বাই নিবাসী আন্না তখড়খের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি শেখা, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্য কাদম্বরী দেবীর 'সাধের আসন' বোনা প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লেখ রয়েছে। একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ 'বসন্ত বিলাপ' অংশে দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর উৎসাহে ঠাকুরবাড়িতে বসন্ত উৎসব শুরু হয়। এই উপলক্ষ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী রচনা করেন 'বসন্ত উৎসব' নামে একটি গীতিনাট্য। এই অধ্যায়ে নারী শিক্ষা বিষয়ে এনেট এক্রয়েড, মেরি কার্পেন্টার, কেশব সেন প্রমুখের অবদানের কথা উল্লেখ পাই। এনেট এক্রয়েড বিশেষ করে কলকাতার মেয়েদের শিক্ষিত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দ্বাদশ অধ্যায় 'জ্ঞানদানন্দিনীর বিলেতবাস' অংশে দেখা যাচ্ছে ব্রাইটনে থাকাকালীন জ্ঞানদানন্দিনীর অসুখ হয়। ড. লিস্টারের সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে। সন্তানসম্ভাবা জ্ঞানদানন্দিনীর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মৃত্যু তাঁকে আরও দুর্বল করে তোলে। শুরু হয় জ্ঞানদানন্দিনীর বিলেতবাসের একাকিত্বের লড়াই, নারীত্বকে আরও কঠোরভাবে গড়ে তোলার প্রয়াস। বিদেশী শিক্ষায় বর্ণভেদ, তাদের অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিদেশীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনীর তীব্র ক্ষোভ দেখা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায় অর্থাৎ 'বই-মালিনী'-তে পুনরায় আবার বই-মালিনীকে দেখতে পাই ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আন্না তখড়খের বিবাহের কথা বলতে আত্মারাম পাণ্ডুরঙের ঠাকুরবাড়িতে আসেন। যদিও পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে বিয়েতে সম্মতি দেননি। পরবর্তী সময়ে আন্নার বিয়ে হয় অধ্যাপক লিটল ডেলের সঙ্গে। উল্লেখ্য, সিঁড়ি থেকে পড়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে ঊর্মিলার মৃত্যু ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে অন্ধকার নিয়ে আসে। যে ঊর্মিলাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী। ঊর্মিলার মৃত্যুর দায় এসে পড়ে কাদম্বরী দেবীর উপর। চরম দুর্দিন নেমে আসে কাদম্বরী দেবীর জীবনে।

উপন্যাসের চতুর্দশ অধ্যায় 'লুসি ও বিনোদিনী'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তখন (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) ব্যারিস্টারি পড়ানোর জন্য ইংল্যাণ্ডে আনা হয়। সঙ্গী হলেন বয়সে বড় তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন পালিত। তখন রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় ছিল বৃটেন নিবাসী লুসি স্কটের বাড়ি। বৃটেনে থাকাকালীন ইংরেজদের গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বা প্ল্যানচেট চর্চা প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট হতে দেখা যায় এই পরিচ্ছেদে। পরবর্তী সময়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে সময় নাট্যজগতের নক্ষত্র হয়ে ওঠেন নটী বিনোদিনী। এই বিনোদিনীকে নিয়েই পরবর্তী সময়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে ভয়ঙ্কর অন্ধকার নেমে আসে। 'শ্রীমতি হে' উপন্যাসের পঞ্চদশ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর শান্তিনিকেতনে আসা, 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (জুন, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ), 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে বাল্মীকি চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয়, কাদম্বরী দেবীর আফিম খেয়ে অসুস্থতা ও তাঁর চন্দননগরে চলে আসা প্রভৃতি ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। উপন্যাসের ষোড়শ অধ্যায় 'বিনোদিনী'। ঊনবিংশ শতকের বাংলা নাট্য রঙ্গমঞ্চের সফল অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী (জন্ম-১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু-ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ)। মালিকের দুর্ব্যবহারে ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। এই বারবণিতার উত্থান-পতন উভয়ই নাটকীয়। যার ঢেউ আছড়ে পড়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের শক্ত ভিত নাড়িয়ে দেয়।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'কবির বউঠান' উপন্যাসের সপ্তদশ অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'মৃণালিনী'। মৃণালিনী দেবী ঠাকুরবাড়ির কাছারির কর্মচারী বেণী রায়ের কন্যা, প্রকৃত নাম ভবতারিণী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য পাত্রী দেখা হলে ভবতারিণীকে নির্বাচিত করেন কাদম্বরী দেবী। যদিও এই বিয়েতে মত ছিল না সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর। অবশেষে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে হয়। উপন্যাসের অষ্টাদশ অধ্যায় 'তারকার আত্মহত্যা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ উপন্যাসের আলোকদ্যুতি এসে পড়ে এই অধ্যায়ে। বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর বিবাহিত জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তার ফলস্বরূপ কাদম্বরী দেবীর আফিম খাওয়া ও তা থেকে মৃত্যু – যেন ঠাকুরবাড়ির এক নক্ষত্রের পতন হল। স্তব্ধ হল ঠাকুরবাড়ির গতিময় জীবন, বিতর্ক দানা বাঁধলো ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের ঊনবিংশতম অর্থাৎ শেষ অধ্যায় 'বিজয়িনী' শীর্ষক অংশে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে দোষ দিয়ে ঠাকুরবাড়ির আশ্রিতা রূপা ঠাকুরবাড়ি থেকে বিদায় নেয়। স্তব্ধ হয়ে যায় 'ভারতী' পত্রিকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুঝতে পারেন তাঁর কৃতকর্মের প্রতিদান 'তারকার আত্মহত্যা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও জ্ঞানদানন্দিনীর স্নেহের আঁচল ছিঁড়ে ফিরে আসেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর কাছে। স্বপ্নে ভাসতে থাকেন 'কবির বউঠান'। যেন "চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।"[৪৪]

'কবির বউঠান' উপন্যাসের শুরুতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঠাকুরবাড়িতে স্ব-মহিমায় প্রবেশ করছেন, পরনে বিলিতি জুতো, নকশি-পাড় দেওয়া মরচে রঙের শাড়ি। সময়টা ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল কেঁপে উঠলো। প্রথাগত নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ঠাকুরবাড়ির বধূর এ হেন প্রবেশই যে একপ্রকার নারী জাগৃতির সূচনা করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পুরুষতান্ত্রিক উগ্রতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ; সে যূপকাষ্ঠে পিষ্ট হতে হতো নিম্নবর্ণ মানুষ আর নারীকে। নারীজাগৃতির প্রথম সোপান সেই সময় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে রব উঠলেও পথটা এতটা সুগম ছিল না, কেননা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তার তীব্র বিরোধিতাও ছিল। যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীপ্রগতির বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যচর্চা বা শরৎকুমারী দেবীর রূপচর্চার মাধ্যমে প্রগতির পথে পা বাড়ালেও "জ্ঞানদানন্দিনীই তো সবার আগে সবরকম বাধা-নিষেধের বেড়া টপকে বৃহত্তর জগতে এসে মেয়েদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন।"[৪৫] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সময়ের স্রোতে শরীর না ভাসিয়ে তার বিপরীতে চলে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে আধুনিকতার আলো প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন। তবে ঠাকুরবাড়ির কর্ত্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সারদাদেবী বহমান জীবনধারাকে বয়ে নিয়ে যেতেই বদ্ধপরিকর, এখানেই একপ্রকার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। প্রবীণ-নবীনের এই দ্বন্দ্বের আঁচ কেবল ভেতরে নয়, ঠাকুরবাড়ির বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কেবল নারীকে শিকল দিয়ে বাঁধা নয়, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদেরও একরকার গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখার প্রবণতা ছিল ঠাকুর পরিবারের মধ্যে। ঘরবন্দী জীবন ছুঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসা প্রসঙ্গে সারদা দেবী বলেছেন, "ঘরের সুচিতা নষ্ট হয়। জানিস না, বাড়ির পুরুষেরাও রাতে শোবার সময়ে ছাড়া যখন-তখন অন্দরে ঢুকতে পারে না! আর সেই বাড়ির মেয়েরা বেটাছেলের সঙ্গে বাইরে গিয়ে হাওয়া খাবে, এমন কাণ্ড কেউ কখনও শুনেছে? লোকে ছি ছি করবে যে!"[৪৬] প্রকৃতপক্ষে নারীচেতনার লড়াই শুরু হয়েছে এখান থেকেই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশের সময় বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। ঘোমটা টানা স্ত্রীকে দিয়েই শুরু হয়েছিল স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী প্রগতির লড়াই।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী। একটি বদ্ধজীবনের মধ্যে আটকে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেন্দ্রিক নারীদের অবস্থানের বিপরীতে তাঁর পথ চলা। তিনি কেবল ঠাকুর পরিবারের একান্নবর্তী বদ্ধ জীবনের বাইরে পা বাড়িয়ে আধুনিকতার মানদণ্ডে উন্নীত হতে চাননি, বরং নারীদের সামাজিক শিকল ছিঁড়ে বাইরে আসার একটা মানসিক সাহস জুগিয়েছিলেন। 'কবির বউঠান' উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী হয়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কাদম্বরী দেবীর প্রবেশ হয় ২৩শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ৫ই জুলাই। যদিও এ বিয়েতে মত ছিল না জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস উত্তীর্ণ ডাক্তার সূর্যকুমার গুটিফ চক্রবর্তীর শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে। আসলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিক্ষা-দীক্ষা বা বাড়ির বাইরে পা ফেলা নারীমননের যে আধুনিক স্রোত আনতে চেয়েছিলেন, তার সঠিক মানদণ্ড ছিল না কাদম্বরী দেবীর মধ্যে। ঠাকুরবাড়িতে মাতঙ্গিনী গাঙ্গুলী থেকে কাদম্বরী দেবীতে উত্তীর্ণ হওয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে একপ্রকার চোখের বালিতে পরিণত হয়। দ্বন্দ্ব তৈরি হয় ঠাকুরবাড়ির দুই বধূর। ঠাকুরপো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি অধিকার কমতে থাকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এবং তা নিয়ে একপ্রকার ক্ষেদের সুরেই বলেছেন, "জ্ঞানদা উজ্জ্বল মুখে প্রিয় দেওরের দিকে তাকালেন, এতদিনে তোমার আসার সময় হল ঠাকুরপো, আমি তো ভাবলাম নতুন বউ পেয়ে পুরানো বোঠানকে ভুলেই গেছ!"[৪৭] এ একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, যে লড়াই ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে চিরদিন থেকে যায় ঘরের প্রতিটি কোণায়। উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সারদা দেবীর মৃত্যুর পর (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ) যে কালো পর্দা অনেকটা উঠে যায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাত ধরে আসে আধুনিক ছোঁয়া। যে সারদা দেবী বাড়ির বধূ বা মেয়েদের একা বাড়ির বাইরে পা রাখার কঠোর বিরোধী ছিলেন, সেই সারদা দেবী পরবর্তী সময়ে কঠোরতার তীব্র ঝাঁঝ কমিয়ে দিয়েছিলেন। মন থেকে না মানলেও একপ্রকার সময়ের কাছে হার মানতে শুরু করেছিলেন, কেননা "জ্ঞানদা জানেন বাঙালি মেয়েদের মন থেকে এইভাবে এক এক করে অনেক অন্ধকার কাটাতে হবে। এই তো সবে শুরু।"[৪৮] এখানেই যাত্রা শুরু নারী প্রগতির, যে যাত্রার অন্যতম ধারক ও বাহক জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দৃঢ়চেতা মানসিকতা তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অন্যতম দিক। উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে (বিরহিণী পত্রলেখা) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রসন্তানের প্রসব ও মৃত্যু এবং এ প্রসঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পত্রে যে বার্তা, তা যে কোন নারীর কাছে সেই মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত আশ্বস্তের ও সাহসের। চিঠিতে তিনি লিখেছেন – "প্রিয়তম জ্ঞানদা, ১১ই অক্টোবর জানকীর পত্রে দেখিলাম তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে –

আজ তোমার তেরই-এর পত্রে তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। ইহাতে আর কাহার দোষও – তোমারই কি দোষ, ডাক্তাদেরই কি দোষ। জন্মমৃত্যুর উপর আমাদের ত হাত নাই – আমরা নিয়মমত থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, তাহাই কর্ত্তব্য।"[৪৯] তার ঠিক কিছুদিন পরই ঠাকুরবাড়ির দুই জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও জানকীনাথ ঘোষালকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বোম্বাই যাত্রা কেবল হাওয়া বদল নয়, সারদাদেবীর মৃত্যু বা কাদম্বরী দেবীর প্রবেশ প্রভৃতি অনেক ঘটনাই নাড়া দিয়েছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলেত যাত্রা যতখানি না আনন্দের, দুঃখ ততোধিক। বিলেতি আদব-কায়দায় রপ্ত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তিন শিশুকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তার বিলেত যাত্রা একপ্রকার মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষাও বটে। ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দেওয়া জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনও তখন একাকিত্বের। চিকিৎসক জোসেফ লিস্টারের সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব তার জীবনরেখার পথে বাঁক ধারণ করতে পারতো। তবুও দৃঢ়চেতা জ্ঞানদানন্দিনীর একাকিত্বের পরীক্ষাতে হার না মানা লড়াই তাকে সে পথে যেতে দেয়নি। বিলেতবাসেও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দুই সন্তানের মৃত্যু তাঁকে সাময়িক বিধ্বস্ত করলেও সামলে নিয়েছেন পরক্ষণে। বিলেতি আদবকায়দায় মোহিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ওয়াইন পান বা পোষাক-পরিচ্ছেদের সাবলীলতাকে মান্যতা দিলেও বিলেতের বেশিরভাগ সংস্কৃতিকে মান্যতা দেন নি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলেত বাস কালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবেশ এবং দুই সন্তান বিবি ও সুরেনের স্কুল ফিরে 'পাপা' ডাক বা পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'কালো' বলে চিনতে না পারার ঘটনা যে বর্ণভেদের ঘৃণিত মানসিকতা কতখানি মনের অন্দরে রয়ে গেছে দুই বাঙালি সন্তানের, তা উপলব্ধি করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝেছেন, "বিলেতের সব শিক্ষাই ভালো নয়, এখানকার চাপা বর্ণভেদ শিশুর অবোধ মনের গভীরে ঢুকে পড়েছে। এই অন্ধকার তাড়ানোই হবে তাঁর প্রথম কাজ।"[৫০] যে আদবকায়দার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মোহ, তাদের আবেগ, সেই ব্রাইটনেও ভারতীয়দের মতো সেখানকার নারীরাও অবহেলিত। সেখানেও একপ্রকার পুরুষতান্ত্রিক গ্রাসের শিকার নারীরা। জ্ঞানদার উক্তিতে সে কথাই প্রকটিত হয়, "এই যে বিলিতি মেয়েরা আমাদের গান শুনে হাসাহাসি করছিল, এরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানে না। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের ঘরকন্না শিখিয়ে আর লেখাপড়া না শিখিয়ে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়, এখানেও তেমন মেয়েদের পালিশ চলে বিয়ের বাজারে বিকোবার জন্য। বিয়ের জন্য যতটুকু লেখাপড়া দরকার ততটুকুই শেখানো হয়। একটু গান, একটু পিয়ানো, একটু সেলাই, একটু ভালো করে নাচা, একটু-আধটু ফরাসি ভাষা জানলেই বিয়ের বাজারের জন্য তৈরি।"[৫১]

উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদ 'বিনোদিনী'- অংশে জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখা যায়, ঠাকুরবাড়ির গণ্ডী জীবনে তাঁকে হাঁপিয়ে উঠতে। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাশে না পাওয়ার আক্ষেপ, কাদম্বরীর সঙ্গে চোখের বালির সম্পর্কে পরিণত হওয়া, সন্তানহারা মাতৃবেদনা তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। একাকিত্বের মধ্যেই তিনি চেয়েছিলেন মুক্তির স্বাদ। ভবানীপুরের বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়েই সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তিনি পেয়েছিলেন নতুন জীবনের স্বাদ। পূর্ববর্তী চতুর্দশ পরিচ্ছেদে (বিরহিণী পত্রলেখা) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়ের অধিক চিঠিপত্রের উল্লেখ আছে। যেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনীকে 'ভাই', 'প্রিয়তমা', 'আমচী জ্ঞেনুমনি' প্রভৃতি সম্বোধনে পত্র লিখেছেন। প্রতিটি পত্রে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশে থাকার আশ্বাস ও ভরসা জুগিয়েছেন। ঘরে-বাইরে জ্ঞানদানন্দিনীর নারী স্বাধীনতার লড়াইতে স্বামীর ঐকান্তিক সাহচর্য বিশেষ মানসিক শক্তি জোগায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কেবল নারী শিক্ষা বা অধিকারের জন্য লড়েন নি, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথকেও বাইরের জগতের সান্নিধ্য পাওয়াতেও বদ্ধপরিকর ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানিয়েছেন, "আমাদের সঙ্গে থাকলে ওর মনের ধোঁয়াশা কেটে যাবে। আমরা মেয়েরা কত সাহস করে এগিয়ে যাচ্ছি আর ওর মতো প্রতিভাবান ছেলে এমন পিছিয়ে থাকবে কেন?"[৫২] উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যেখানে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রিয় দেওরকে "অনালোকিত কাদম্বরী গ্রাস"[৫৩] থেকে রক্ষা করায় মত্ত ছিলেন, সেই আলোকটুকু উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিলীন হয়ে যায়। আসলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নারী জাগৃতির স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার পথগুলির প্রতিটি বাঁকে ছিল কাঁটা। সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে নারী চেতনার আলো জ্বালাতে সহ্য করতে হয়েছে মানসিক নির্যাতন, চরম অপমান আর সমাজের কুদৃষ্টি। কেবল অদম্য মানসিক দৃঢ়তায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নারী চেতনার জাগৃতির জন্য যে পথ এঁকে দিয়েছেন সে পথটিকেই পাথেয় করে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নারী-স্বাধীনতা আর জ্ঞানালোকের পথ নির্মিত হয়েছে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত 'কবির বউঠান' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বউঠানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কাদম্বরী দেবী। বলতে দ্বিধা নেই, উপন্যাসের প্লট নির্মাণের প্রয়োজনে এই দুই চরিত্র যতটা না ঠাকুরপো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে, তার থেকেও বেশি তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বান্দিকতা, নারী মনস্তত্ত্বের বিরোধিতা এবং সর্বোপরি ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে সম্পর্কের রোষানলে ভাঙন ধরিয়ে কাদম্বরী দেবীর তারকার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে চিরকালের জন্য চলে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা উপন্যাসের নাটকীয়তাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে। উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায় 'কাদম্বরীর প্রবেশ'-এ ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

স্ত্রী হয়ে প্রবেশ করেন কাদম্বরী দেবী। ১৮৫৯ সালের ৫ই জুলাই কলকাতার এক দরিদ্র পরিবারে কাদম্বরী দেবীর জন্ম। পিতা শ্যাম গাঙ্গুলি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির আশ্রিত কর্মচারী। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কাদম্বরী দেবী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হয়ে প্রবেশ করেন ১৮৬৮ সালের ৫ই জুলাই (২৩শে আষাঢ়)। উল্লেখ্য, কাদম্বরী দেবীর জন্ম ও ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশের দিন এক ছিল। কাদম্বরী দেবীর প্রকৃত নাম মাতঙ্গিনী গাঙ্গুলি। ঠাকুরবাড়ির চৌকাঠের ভিতরে তাঁর নাম হয় কাদম্বরী দেবী। এই "নববধূকে দেখে জ্যোতিরিন্দ্রের রোমান্টিক মন দুলে উঠল। এই শ্যামল বালিকাকে তিনি নিজের মতো করে গড়েপিটে নেবেন।"[৫৪] এই 'গড়েপিটে' শব্দটার মধ্যেই দানা বাঁধে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে এক পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা। যে ভাববার শিকল ছিঁড়ে মুক্ত আলো দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষিতা, আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। অপরপক্ষে, কাদম্বরী দেবীর মতো অশিক্ষিত বধূ চক্ষুঃশূল হয়ে ওঠেন জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দূরত্ব বাড়তে থাকে ঠাকুরবাড়ির দুই বধূর। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যেখানে স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যেমন পেয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা, তেমনি পেয়েছিলেন ভরসার স্থলও। অপরপক্ষে কাদম্বরী দেবী উদাসীন স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন শূন্যতা ও একাকিত্ব। নীচু চোখে দেখা নববধূ কাদম্বরী দেবী ক্রমশই নিষ্প্রভ হতে থাকেন।

ঠাকুরবাড়িতে নববধূ হয়ে কাদম্বরী দেবীর প্রবেশের সময় বয়স ছিল নয় বছর, রবীন্দ্রনাথের সাত। প্রায় সমবয়সী রবীন্দ্রনাথ একাকিত্বের যন্ত্রণায় বিদ্ধ কাদম্বরী দেবীর ভরসার স্থল হয়ে ওঠেন। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। রবীন্দ্র-কবিতার সেতু নির্মাণ করে বউঠান ও দেওরের মধ্যে। সমালোচক চিত্রা দেব বলেছেন, "কিশোর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে সবচেয়ে উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিলেন এই কাদম্বরী, সেই বাঁধন কোনদিন শিথিল হয়নি।"[৫৫] অপরপক্ষে উদাসীন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সাবেক সংস্কার পরিত্যাগ করে কাদম্বরী দেবীকে যেমন শিক্ষিত করেছিলেন, তেমনি ঘোড়ায় চড়াও শিখিয়েছিলেন। এই ঘোড়ায় চড়া ইউরোপীয় শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে ধরা হতো। সেই সময়ের সমাজের বিপরীত স্রোতে গিয়ে "কাদম্বরী শুধু ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেই বেরিয়েছিলেন তা নয়, সাধারণ নারীদের চোখে এঁকে দিয়েছিলেন এক দুঃসহ স্পর্ধার মায়াঞ্জন, অনেকের বুকে তিনি জুগিয়েছিলেন সাহস।"[৫৬] কেবল ঠাকুরবাড়ির বধূ নয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মেয়ে রমলা বা কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীও ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ বা বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঘোড়ায় চড়তেন। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'বিরহিণী পত্রলেখা' অংশে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'স্বর্ণকুমারীর বোম্বাইবাস' অংশে স্বর্ণকুমারী দেবীর বোম্বাই যাত্রা ও পরবর্তী সময়ে সারদা দেবীর

মৃত্যুতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে যেন চৈত্রের শুকনো বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। কাদম্বরী দেবী সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে এলেন শ্রাবণের ধারা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন 'সরোজিনী' নাটক, নাটকের গুরুত্বপূর্ণ গানটি 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' লিখলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি মন জয় করলেন নতুন বউঠানের। বটতলার সাহিত্য ছেড়ে ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশিত হল। পত্রিকাটির প্রথম নাম 'সুপ্রভাত' ছিল, নামটি পছন্দ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যচর্চার নতুন স্রোত বইতে থাকল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর স্নেহের সম্পর্ক আরও নিবিড় হল সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে। 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ কর্মে ডাইনি প্রসঙ্গে কাদম্বরী দেবীর স্বাধীন প্রসঙ্গ বা পুরুষের মুণ্ডু চিবিয়ে খাওয়া উক্তিতে কাদম্বরী দেবীকে জানালেন, "হে আমার মাথা চিবিয়ে খাওয়া দেবী, আজ থেকে তোমার নাম দিলেম হেকেটি ঠাকুরণ।"[৫৭] এই 'হেকেটি ঠাকুরণ'ই প্রেরণাদাত্রী হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর। রবীন্দ্র-কাব্য সৃষ্টিতে 'হেকেটি ঠাকুরণ'ই হয়ে ওঠেন রবীন্দ্র-কবিতার বিয়াত্রিচে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যেতে থাকলেন কাদম্বরী দেবী।

মাত্র ষোল বছরের বিবাহিত জীবন কাদম্বরী দেবীর। ঠাকুরবাড়িতে নববধূ রূপে প্রবেশ থেকে 'হেকেটি ঠাকুরণ' এবং তা থেকে কেবল রবীন্দ্র-জীবনে নয়, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী। সেই অন্দরমহলে এত ভীড়ের ঘনঘটা সত্ত্বেও একাকীত্ব তাঁকে গ্রাস করেছিল ক্রমশ। একাকিত্ব জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদম্বরী দেবীর কাছে হয়ে উঠলেন অতল স্রোতে ভেসে যাওয়া একটি বিপথগামী মানুষের খড়-কুটোর ভরসার আপেক্ষিক শক্ত খুঁটিটি। উপন্যাসের দশম অধ্যায় 'আনাবাই নলিনী' অংশে বিলেত যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্তৃত চিঠি নতুন বউঠানকে লিখেছিলেন, তাতে রয়েছে – "সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকুল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমস্ত ফুলে ফেঁপে উঠছে – সে এক মহাগম্ভীর দৃশ্য।"[৫৮] কী নিদারুণ ভাবে জাহাজের যাত্রাপথের সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ যেন মিলিয়ে দিয়েছেন কাদম্বরী দেবীর জীবনপথের দৃশ্যও।

উপন্যাসের পঞ্চদশ অধ্যায় 'শ্রীমতি হে' শীর্ষক অংশে আমরা কাদম্বরী দেবীকে উতলা হতে দেখি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে, যিনি আবার উতলা নটী বিনোদিনীর জন্য। বিনোদিনী-তাপে ঝলসে যাওয়া জ্যোতরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্ত্রী-সোহাগে আবৃত রাখতে চান কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসে বিনোদিনী-ঝড় আটকাতে চেয়েছেন

কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রনাথও সেই সময়ে কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করেন 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থটি। একদিকে রবীন্দ্র-সৃষ্টি প্রতিভা ক্রমশ প্রকটিত হতে থাকে, অন্যদিকে কাদম্বরী দেবী নিমজ্জিত হতে থাকেন নিঃসঙ্গতায়। যদিও জোড়াসাঁকোর বাড়ির গঞ্জনা বা কোলাহল শান্তিনিকেতনে ছিল না, ছিল কেবল জ্যোতির অনুপস্থিতির নির্জন হাহাকার। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সন্দেহের বাইরে রাখতে পারেন নি কাদম্বরী দেবী। তাই ছদ্মবেশে নাট্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে চাক্ষুষ দেখেন জ্যোতিরিন্দ্র-বিনোদিনীর রোমান্টিকতা। ওই পরিস্থিতিতে জোড়াসাঁকোয় ফিরে এসে রুপোর কৌটোয় জমানো আফিমের গুলি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। একদিকে 'ভগ্নহৃদয়' যখন পাঠক মহলে আলোড়ন তুলতে শুরু করে, অন্যদিকে তখন কাদম্বরী দেবীকে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে শুনতে হচ্ছে তীব্র কটাক্ষ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহল থেকে তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে বাক্যবাণ, "খেলেই যদি, অত অল্প করে খেলে কেন, সেই তো ফিরে আসতে হল আমাদের মধ্যে! মাঝখান থেকে কর্তাদের ঝুটঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে, বাইরে জ্যোতিঠাকুরকে নিয়ে কত কানাকানি। নিজের বরকে এমন বদনাম করে মুখ দেখাচ্ছ কী করে?"[৫৯] অর্থাৎ নারী কর্তৃক নারীকেই হতে হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। যে কাদম্বরী দেবীকে সুশ্রী হওয়াতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে অপদস্থ হতে হয়, বন্ধ্যা নারীত্বের অপমান মাথায় নিয়ে সহ্য করতে হয় ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহলের কটু কথা, অথচ সে সমাজ একবারও আঙুল তোলেনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিকে, যিনি একপ্রকার স্ত্রীকে ঠকিয়ে ব্যাভিচারী পথে হেঁটে বেড়িয়েছেন। 'অপয়া' তকমা জুটে যাওয়া কাদম্বরী দেবী মরতে চেয়েছেন বারংবার, 'মানময়ী'র গানের কলি ধরে বুঝিয়ে দেন সে যন্ত্রণা –

"সজনী লো সজনী,

কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না?...

এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।"[৬০]

কিছুটা সুস্থ হয়ে কাদম্বরী দেবী জোড়াসাঁকো ছেড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চন্দননগরের গঙ্গাতীরের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেখানকার নির্ভেজাল আড্ডাতে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া কাদম্বরী দেবীর অন্তঃজীবন স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। অসুস্থ কাদম্বরী দেবী একাকিত্বের জীবনে কেবল পাশে পান রবীন্দ্রনাথকে। মন ও মানসিকতার পারস্পরিক সৌহার্দ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও ক্রমশ উজ্জ্বল করে তুলেছিল ব্যক্তি ও সাহিত্য জীবনে।

স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যহ অভাব কাদম্বরী দেবীর অন্তঃস্থলকে একপ্রকার ভগ্নদশায় পরিণত করে। অষ্টাদশ অধ্যায় 'তারকার আত্মহত্যা'-তে দেখা যায় সদর স্ট্রীটের বাড়িতে ঠাকুরবাড়ির আশ্রিতা রূপার সঙ্গে তাস খেলতে বসা বা কাব্যপাঠে নিয়োজিত কাদম্বরী দেবী নিমজ্জিত হতে থাকেন জীবন থেকে। একপ্রকার ঘরছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে কাদম্বরী হয়ে ওঠেন গৃহলক্ষ্মী, আর নটী বিনোদিনী হয়ে যান উত্তেজক মদিরা। অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের কাছে নারী কেবল হয়ে ওঠে সময় অতিবাহিত করার একটি যন্ত্র মাত্র। বিনোদিনীর শরীরে পুঁতে দেওয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষুদ্র বীজের সন্ধান পান কাদম্বরী দেবী একটি চিঠিতে, যে চিঠি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন নটী বিনোদিনী এবং সেই চিঠিই কাদম্বরী দেবীকে ঢেকে দেয় এক অন্ধকারের মধ্যে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' জাহাজ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জ্যোতি-ডাকের অপেক্ষায় বসে থাকা কাদম্বরী দেবী ১৯শে এপ্রিল শেষবারের মতো কমলা রঙের স্বর্ণচরি শাড়ি পরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত ডাক না এলে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া কাদম্বরী দেবী পুনরায় আফিম সেবনে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। কাদম্বরী দেবী খুলতে থাকেন শরীরে ঢাকা এক-একটি অলংকার, আর এগোতে থাকেন মৃত্যু পথের দিকে। সারদা দেবীর মৃত্যুতে ঠাকুরবাড়িতে যেমন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়েছিল, কাদম্বরী দেবীর মৃতুতেও যেন অন্য এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল। 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে চিত্রা দেব কাদম্বরী দেবীর চলে যাওয়াকে বর্ণনা করলেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে, "নিজের হাতে জীবনপ্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে অন্তরালে চলে না গেলে তিনি হয়তো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের রসের উৎসটিকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে সোনালি দিনগুলি শীতের পাখির মতো বিদায় নিতে শুরু করলো।"[৬১]

যে স্মৃতি সুখের হয় না, সে স্মৃতি বহন করাও বৃথা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে জড়িয়ে কাদম্বরী-শোক ভুলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও ভুলতে চেয়েছেন গানের মধ্য দিয়ে। কাদম্বরী দেবীর ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে অনেকটা ছিল 'অনধিকার প্রবেশ'-এর মতো। যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সাধনার অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন কাদম্বরী দেবী, সেই রবীন্দ্রনাথই স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে জড়িয়ে কুহকিনী কাদম্বরী দেবীকে বলতে পেরেছিলেন "হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।"[৬২] এই নতুনের খেলাই চলে সর্বব্যাপী, পুরাতন কেবল স্মৃতি হয়ে থাকে, তারপর কালের অমোঘ নিয়মে কেবল ধূসরেই পরিণত হয়।

সে যাই হোক, ঠাকুরবাড়ির অন্দর আলোকিত করেছিল তুলনামূলকভাবে নারীরা, অন্তত ‘কবির বউঠান’ উপন্যাসে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত। উপন্যাসটিতে মূলত নারীর চেতনা, নারীর আশ্রয়, নারীর জীবন – এই ত্রিবিধ ধারাতেই প্রদক্ষিণ করেছে সামগ্রিক বিষয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছাড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির বাইরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে সে সময়কার ঠাকুরবাড়ির গর্ব বা ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার মূলে ছিল নারীরা। সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে সাহিত্যচর্চার দীপশিখা জ্বললেও তার আলো ছড়িয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বরী দেবী প্রমুখ। উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায় ‘হেকেটি ঠাকুরণ’ অংশে ‘ভারতী’ পত্রিকা প্রকাশের (জুলাই, ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্য দিয়ে যে সাহিত্যচর্চা একপ্রকার আলোড়ন ফেলেছিল সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে, সেই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কাদম্বরী দেবীর মধ্যে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হয়। ‘ভারতী’ পত্রিকার জন্য কাদম্বরী দেবীকে রবীন্দ্রনাথের ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের অনুবাদ শোনানো বা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা শোনানো, সে লড়াই আরও প্রকটিত হতে থাকে। সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই কাদম্বরী দেবী আসতে আসতে তুলে ফেলেছেন অন্তঃপুরের পর্দা।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার দিক থেকে সবথেকে বেশি সপ্রতিভ ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ‘ভারতী’ পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে দ্বন্দ্ব দেখা যায় ভারতী ও বটতলার সাহিত্যের মধ্যে। এই পত্রিকাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘দীপনির্বাণ’ (প্রকাশ ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) উপন্যাসের বিষয়ভাবনা যতটা না প্রভাব ফেলল, তার থেকে বেশি সাড়া ফেলল ঠাকুরবাড়ির মহিলা লেখিকার রচিত প্রথম উপন্যাস হিসাবে। উল্লেখ্য, উপন্যাসটি প্রকাশের সময় লেখকের যে নাম ছিল না, তার প্রধান কারণই ছিল পুরুষতান্ত্রিকতার আধিপত্য, যে আধিপত্যের মধ্যে সাহিত্যচর্চাও ছিল একনায়কতন্ত্রেরই সামিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস লেখার প্রধান কারণ হিসাবে তিনি “মেয়েরা লিখতে পারে না।”[৬৩] – এই পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা থেকেই উত্তরণের একটি প্রয়াস তিনি দেখিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। মেয়েদের এই সাহিত্যচর্চার মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ভাবনার মধ্যে পার্থক্য ছিল ভীষণ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মাতৃত্বের সঙ্গে সাহিত্যচর্চাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন, স্বর্ণকুমারী দেবী সেখানে মাতৃত্বের প্রতি অধিক আনুগত্যকে অস্বীকার করে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হওয়ার কথা বলেছেন। তবে দু'জনেই মূলত সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বাড়ির বাইরে পা রেখে জগৎ ও জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সাহিত্যচর্চার অন্যতম কাণ্ডারী যে কাদম্বরী দেবীও, এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ'-এর পাশাপাশি আরও দুই মহিলা লেখিকার জন্ম হয়। প্রথম জন কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (গ্রন্থনাম – 'রূপজালাল'), অন্যজন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামের সীতানাথ সরকারের স্ত্রী রাসসুন্দরী দেবী (গ্রন্থমাম – 'আমার জীবন')। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনকেও নাড়া দেয়। গ্রন্থে উল্লেখ, রাসসুন্দরী দেবী দিনের সমস্ত কাজ সেরে পড়াশোনা করতেন এবং তা গোপনে। তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লিখিত –

"এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।

পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী, জালে বন্দী মীন।"[৬৪]

অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্ট, সে সময়ের মেয়েদের নির্লিপ্ত ভাবে জীবন কাটানোর যন্ত্রণা। শিক্ষার অধিকার কেবল ছেলেদের, মেয়েদের রান্না করা আর ঘর গোছানো। পুরুষতন্ত্রের এই নির্মমতার কথা রাসসুন্দরী দেবী তুলে ধরলেন তাঁর 'আমার জীবন' জীবনীমূলক গ্রন্থে, রাতের অন্ধকারে। যে গ্রন্থ সাড়া ফেলেছিল জনমানসে, নাড়িয়ে দিয়েছিল পুরুষতান্ত্রিকতার মিথ্যে ভিতকে। ঠিক তেমনভাবে না হলেও স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যও ঠাকুরবাড়ির অন্দরে যে পুরুষতান্ত্রিকতার চরম ছায়া নারীর স্বাধীনতাকে দমিয়ে রেখেছিল, বিশেষ করে সাহিত্যচর্চাও যে কেবল একপ্রকার পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত হানলেন। রচিত হল মেয়েদের কলমে একের পর এক গ্রন্থ, বাড়ির মেয়েরা বাইরে বেরল, যার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের এই মহতী কাজে বরাবর সাহস জুগিয়েছেন।

উপন্যাসে ঠাকুরবাড়ির অন্দরে সাহিত্যচর্চার যে ঢেউ এসেছিল তার কেন্দ্রে অন্যতম মাধ্যম ছিল বইমালিনী চরিত্রটি- যা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব সৃষ্টি। নদীর শ্লথ ধারাকে আরও বেগবান করে তোলার প্রয়োজনেই হয়তো মল্লিকা সেনগুপ্ত এই চরিত্রটি আনয়ন করেন। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছদেই অর্থাৎ 'সারদাসুন্দরীর সংসার'-এ বইমালিনীর সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটে। বইমালিনী ধনী বাড়ির মেয়েদের বই বিক্রি করে। অর্থাৎ এ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, উনিশ শতকের প্রথম বা মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি মহিলাদের লেখাপড়ার সাধারণ একটি পরিচয় পাই, তবে সে মহিলারা মধ্য বা নিম্নবিত্ত পরিবারের নন। স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে সাধারণ পড়াশুনাতেও উচ্চ-নিম্ন পরিবারের একটি ভেদাভেদ ছিল। কেবল পড়াশুনার ক্ষেত্রে নয়, তখনকার সময়ে বড়ঘরের মেয়েদেরই বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি ছিল। উদাহরণ হিসাবে ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত ভোপালের বেগমের কথা উল্লেখ করেছেন। বইমালিনীর ঝুড়িতে যেমন 'সোমপ্রকাশ', 'ভারত মহিলা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', দীনবন্ধু

মিত্রের 'জামাইবারিক' গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি ম্যারি ওলস্টোনক্র্যাফটের 'এ ভিণ্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ উইমেন' গ্রন্থেরও সন্ধান রয়েছে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি পত্রিকা বা গ্রন্থে নারীর যন্ত্রণা, পুরুষশাসিত সমাজের বেড়ি বা সমকালীন নারী মননের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসটিতে বইমালিনী চরিত্রটি একপ্রকার সমাজের দর্পণ বলা যেতেই পারে, যে একদিকে রুচিশীল এবং অন্যদিকে শিক্ষিতাও বটে। "সময় আমাকে ছুঁতে পারে না"[৬৫] – বই-মালিনীর এই কথার সূত্র ধরেই বাহিত হতে থাকে তার ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার রূপটি। কী হবে, কেন হবে – এ জাতীয় সকল জিজ্ঞাসা যেন ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে আলোর সঞ্চার করেছে এবং সৃষ্টি করেছে দ্বন্দ্বও। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে বামাসুন্দরীর চিঠিতে যেমন মেয়েদের চালচলনে তাদের নিজস্ব মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি সরমা ও সুশীলার কথোপকথনে নতুন ও পুরাতনপন্থী দুই নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অবস্থানের কথাও প্রকাশিত হয়েছে; পুরুষশাসিত সমাজ যে নারী কর্তৃকও চালিত তা ধরা পড়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে 'বটতলা বনাম ভারতী পত্রিকা' অংশে পুনরায় বইমালিনীর প্রবেশ এবং একটি প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর লোকায়ত প্যারডি, যা একসময়ে মহিলা ঝুমুর দলের গায়িকা ভবানীর গলাতে গীত হয় –

"চল সই বাঁধা ঘাটে যাই অ-ঘাটের জলের মুখে ছাই
ঘোলাজল পড়লে পেটে গাটা অমনি গুলিয়ে ওঠে... "[৬৬]

অপরদিকে মালিনীর গলায় ঘেউড় গান জ্ঞানদানন্দিনী বা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়। এই শ্লীলত্ব-অশ্লীলতার দ্বন্দ্বও শুরু হয় ঠাকুর পরিবারে, ভাগাভাগি অবস্থান করে বটতলা ও ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য। অথচ মালিনীর রসবোধ যে অনেক উচ্চস্তরের ছিল তার প্রমাণ পাই তার বই সংগ্রহ বা সন্ধানের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদটি 'বই-মালিনী'। এই পরিচ্ছেদে বই-মালিনী নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর ভবিষ্যৎ গল্পের সন্ধান দেয়। মালিনীর গল্প-বর্ণনা, গল্পে কাদম্বরী দেবীর চরিত্র হয়ে ওঠা – যেন কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে যায় অসীমের উদ্দেশ্যে, জাগরিত করে নারীত্ব বোধকে। মালিনীর আষাড়ে গল্প ধরা দিতে থাকে বাস্তবে, রূপ পায় কাদম্বরী দেবীর বাস্তব জীবনে। যে গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানভঞ্জন' গল্পে প্রকাশিত হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'শ্রীমতি হে' অংশে কাদম্বরী দেবী, বইমালিনী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ঘরে অবস্থানে মালিনীর ঘোর কাটে, ফিরে আসে বাস্তবতায়। যে বাস্তবতা আরও উজ্জ্বল, আরও তীক্ষ্ণ।

'কবির বউঠান' উপন্যাসে কাদম্বরী দেবীর পাশাপাশি যে চরিত্রটি বেশি উপেক্ষিতা, তিনি নটী বিনোদিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম আশ্রয়। এই আশ্রয়ই কাদম্বরী দেবীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে, নিরাশ্রয় করে। ঊনবিংশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল মুখ অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী। যে রঙ্গমঞ্চ বারবণিতা বিনোদিনীর মতো চরিত্রেই সমুজ্জ্বল থাকে, সচ্ছল বা শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের কাছে ছিল যা বিপদজনক পেশা। এই বিপদজনক পেশাতেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে সেদিনকার রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন বিনোদিনী। বিলিতি আতরের গন্ধ ছেড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত হন রঙ্গমঞ্চে, বিনোদিনীর কাছে। অপরূপা বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সরোজিনী' নাটকের প্রধান চরিত্র রূপে বিনোদিনীকে স্থান দিলে পাশাপাশি আসেন দু'জনে, আর কাদম্বরী দেবী ক্রমশ সরতে থাকেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিক জীবন থেকে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অবাঙালি ব্যবসায়ী মালিক প্রতাপচাঁদ জহুরীর অপমান সহ্য করতে না পেরে ১৮৮৩ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ গড়ে তুলেছিলেন স্টার থিয়েটার। কিন্তু স্টার থিয়েটার গড়ে তোলার অর্থ জোগান দেন ব্যবসায়ী গুরুমুখ রায়, পরিণামে তার প্রয়োজন বিনোদিনীর শরীর। বিনোদিনী বুঝে যান, "একদিকে তাঁর সামনে রঙ্গালয়ের তারাভরা আকাশ, আর তিনি সেই আকাশের পরী; অন্যদিকে কালিমাখা জীবনযাপনের জন্য রঙ্গকর্মীদের জোরাজুরি। জীবনের অতীতকে পিছনে ফেলে যত তিনি উত্তরণ চান, তত যেন সবাই মিলে তাঁকে সেই পাঁকে ডোবাতে চাইছে।"[৬৭] ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুলাই স্টার থিয়েটার উদ্বোধন হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এরই মধ্যে বিনোদিনীর পুরানো প্রেমিকের ফিরে আসা, বিনোদিনীকে নিয়ে গুরুমুখ রায়ের শহরের নানান প্রান্তে লুকিয়ে বেড়ানো, গুরুমুখ রায়ের বাড়ি ফিরে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে থাকে। তবে বিনোদিনীকে দেওয়া গুরুমুখ রায়ের স্টার থিয়েটারের অংশীদারিত্ব ছলে-বলে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কেড়ে নেওয়ায় একপ্রকার প্রতারণার শিকার হন নটী বিনোদিনী। যে বিনোদিনীকে একদিন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব 'চৈতন্যলীলা' নাটকে অভিনয় দেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। প্রায় সবকিছু হারানো বিনোদিনীর একমাত্র আশ্রয় হয়ে ওঠেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘটনার ঘনঘটায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বিনোদিনী দেহমনে লীন হলে সন্তানসম্ভবা হন বিনোদিনী। যে খবর সারা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, কাঁদিয়ে দিয়েছিল কাদম্বরী দেবীর নারীত্বকে। 'সরোজিনী' নামক জাহাজের উদ্বোধনে ব্যতিব্যস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী

কাদম্বরীকে ডাকার সময়টুকু পাননি, অন্যদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বুকে ধাক্কা দেওয়া বিনোদিনীও মিলিয়ে যান ভাটার টানে। ক্ষণিকের আশ্রয় কোন নারীকে তৃপ্তি দিতে পারে না, পুরুষকেও না। অবস্থানভেদে আলাদা হলেও কাদম্বরী দেবী ও নটী বিনোদিনী দু'জনেই হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ের আশ্রয় ও একাকিত্ব কাটানোর স্থান বিশেষ। চরম অপমান ও অনাদর নিয়ে চলে যেতে হয়েছে দু'জনকেই। নারীর নারীত্বকে অবজ্ঞা কেবল নয়, সামাজিক পাশা রূপেই তাদের পরিগণিত করেছে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।

অপরদিকে ঔপন্যাসিকের অনবদ্য সৃষ্টি রূপা চরিত্রটি। ক্ষণিকের অতিথি হয়ে যেন চিরকালীন একটি আসন পেতে নিতে চেয়েছিল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। অসীমকে ছুঁতে পারার বাসনা, অন্দরমহলের গণ্ডি ঘেরা জীবনের প্রতি ক্ষিপ্ততা বা মনের মানুষ নির্বাচনে নিজস্ব মতবাদ তাকে আর কয়েকটা সাধারণ নারী চরিত্রের থেকে পৃথক করেছে। সারদাদেবীর সংসারে এসে মেয়ের সম্মান বা বর্ণকুমারী দেবীর কাছে চক্ষুঃশূল হয়েও তাকে কখনো নিষ্প্রভ হতে দেখা যায় নি, বরং সোজাসাপটা কথা বলেই নিজের অধিকারের কথা জানান দিয়েছে বারংবার। ঠাকুরবাড়ির অনধিকারী এই রূপা সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যেমন পুরুষতন্ত্র তথা প্রথাগত ধারণার বিরূদ্ধে আঙুল তুলেছে, তেমনি কাদম্বরী দেবীর পাশে থেকে নারী স্বাধিকার লড়াইয়ের কথাও স্পষ্ট ভাবে বলেছে।

কেবল চারিত্রিক রূপায়ণেই 'কবির বউঠান' উপন্যাসের নারী জাগৃতির কথা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেননি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরেছেন। যেখানে উপন্যাসের চরিত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের মাধ্যমে গাম্ভীর্যপূর্ণ দিকও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশের যে পরিহিত পোশাকের বর্ণনা বা বিদেশে থাকাকালীন (দশম পরিচ্ছেদ – 'আনাবাই নলিনী') বিদেশি ছোঁয়ার মধ্যে থেকেও নিজের জাতির আভিজাত্যকে পরিহিত পোশাকের মধ্যে তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত অভিনব। অথবা উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ('স্বর্ণকুমারীর বোম্বাইবাস') কবিতার আসরে স্বর্ণকুমারী দেবীর কমলা রঙের পাটোলা সিল্ক পরে আসর জমানো বা উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে ('আনাবাই নলিনী') কাদম্বরী দেবীর বহুবর্ণ জ্যাকেটের সাথে নীলাম্বরী শাড়ি পরা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ('বই-মালিনী') বিনোদিনীর সন্ধানে আটপৌরে ধনেখালি শাড়ি পরে গোপনভাবে যাওয়া এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ('তারকার আত্মহত্যা') জাহাজ উদ্বোধনের ডাক আসবে স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে – এই আশায় জীবনের শেষবারের মতো কমলা রঙের স্বর্ণচরি শাড়ি পরিধানের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ ঠাকুরবাড়ির অন্দরের এক আভিজাত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে, যে আভিজাত্য আসলে

পুরুষতান্ত্রিকতার ছায়ায় ঘেরা এবং তার মধ্যেও পোশাক ব্যবহারে নারীদের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম লড়াই ধরা দেয়।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'কবির বউঠান' উপন্যাসে একটি পরিবারের মধ্যে থাকা একটি সময়কে তুলে ধরেছেন, যে সময় একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের সমাজ ও সাহিত্যচর্চার সার্বিক গতিকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে নারী জাগৃতির যে অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছিল তাতে ঠাকুরবাড়ির অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। একদিকে রক্ষণশীল সমাজ এবং অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের জীবনচর্চাকে একপ্রকার অন্ধকার ঘরে তালাবন্দী করেছিল। সেই তালাবন্দী অন্ধকার ঘর ভেঙে ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী বা কাদম্বরী দেবীর মতো নারীরা এগিয়ে এসে জ্বালিয়েছিল নারীজাগরণের মশাল, শক্ত হাতে ধরেছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরূদ্ধে শক্ত ব্যাটন। সমাজের গণ্ডি উপেক্ষা করা শিক্ষিতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অনায়াসে বিচরণ করেছেন দেশে-বিদেশে, অন্যদিকে কাদম্বরী দেবী ঠাকুরবাড়ির বাজার সরকারের কন্যা হয়েও রূপে-গুণে মন জয় করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্দরের মধ্যে, অন্দরে আসা সাহিত্যরসিক জনদের। আত্মহত্যার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অস্তিত্বের ভিন্ন সুর, নাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্দরের শক্ত পুরুষতান্ত্রিক ভিতকে। সমাজ ও সাহিত্যে কেবল নারী অস্তিত্বের লড়াই যেমন করেছেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তেমনি পরিবারের অভ্যন্তরের শিকলকে দুমড়ে-মুচড়ে নীরবে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন কাদম্বরী দেবী। ঠাকুরবাড়ির অন্দরে প্রবেশ থেকে 'তারকার আত্মহত্যা' পর্যন্ত যে জীবন কাদম্বরী দেবীর, তাতে তিনি পেয়েছেন অনাদর, বন্ধ্যাত্বের অপমান, লাঞ্ছনা আর সরোজিনী-শোক। ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গক্রমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' উপন্যাসের কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথই হয়ে ওঠেন চরিত্র। রবীন্দ্র-পরিবারে পুরুষদের অতিক্রম করে নারীরাই হয়ে ওঠেন আধুনিকতার বাহক। মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কবির বউঠান' উপন্যাসেও কেবল কবির বউঠানের মর্মভেদী হাহাকার ধরা দেয় নি, বরং বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ঠাকুর পরিবারের নারীদের হাত ধরেই নারীদের নতুনভাবে বাঁচার লড়াই। সমাজ ও সাহিত্যে যে নারীরাও অচ্ছুত নয়, তারই একপ্রকার জাগরণ সূচিত হয়েছে 'কবির বউঠান' উপন্যাসে। উপন্যাসে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা আসলে পুরুষতান্ত্রিকতার বন্দী জীবন থেকে মুক্তির লড়াই, এই আত্মহত্যাই জাগিয়ে তোলে নারী যন্ত্রণার প্রতিটি চিন্তন ও মননকে ।

তথ্যসূত্রঃ

১. বসু, রাজশেখর : 'বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম মুদ্রণ – ১৩৫৩, অষ্টাদশ মুদ্রণ- ১৪২৮, পৃষ্ঠা ৩৪৯

২. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৪৯

৩. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৫০

৪. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬৮

৫. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৫

৬. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৫

৭. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৮

৮. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৯

৯. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ২১৪

১০. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৮৫

১১. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১০৪

১২. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১১৬

১৩. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৬

১৪. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩১

১৫. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৮৫

১৬. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৮৫

১৭. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৮০

১৮. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৭৩

১৯. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৪২৯

২০. মণ্ডল, মলয় : 'নারীবাদী তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিয়', প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা ৩৩

২১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ৬৮

২২. মণ্ডল, মলয় : 'নারীবাদী তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিয়', প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা ৩৬

২৩. নাসরিন, তসলিমা : 'নির্বাচিত কবিতা', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর ২০২১, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৯৪

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'প্রাচীন সাহিত্য', 'রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০১৭, প্রথম সংস্করণ – পৌষ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ – চৈত্র ১৪২২, পৃষ্ঠা ৬৬২

২৫. সরকার, সুবোধ : 'সীতা', 'শুধু আবৃত্তির জন্য', দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০০৬, অষ্টম মুদ্রণ – আগষ্ট ২০১২, পৃষ্ঠা ২৯১

২৬. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯,

প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ১২৩

২৭. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১২৬

২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ্চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০১৭, প্রথম সুলভ সংস্করণ – পৌষ ১৩৯৬, শেষ পুনর্মুদ্রণ – চৈত্র ১৪২২ পৃষ্ঠা ৬৯১

২৯. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯

৩০. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৮২

৩১. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৪

৩২. বাগচী, নন্দিতা : 'এবং মুশায়েরা'(সম্পাদনা), ২৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ – বৈশাখ ১৪২৪, পৃষ্ঠা ২৮৫

৩৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৭২

৩৪. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৯১

৩৫. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১২৬

৩৬. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৮

৩৭. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৬

৩৮. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১২৩

৩৯. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৫

৪০. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২১০

৪১. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২১০

৪২. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৭৯

৪৩. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৫

৪৪. দেব, চিত্রা : 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭, নবম মুদ্রণ – জুন ২০১৮, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৫৬

৪৫. দেব, চিত্রা : 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭, নবম মুদ্রণ – জুন ২০১৮, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৬

৪৬. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ২১৩

৪৭. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৮

৪৮. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৩১

৪৯. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৪

৫০. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩৫

৫১. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৪১

৫২. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৭

৫৩. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৭

৫৪. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৪

৫৫. দেব, চিত্রা : 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭, নবম মুদ্রণ – জুন ২০১৮, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৪৭

৫৬. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৪৮

৫৭. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৮২

৫৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭, সুলভ সংস্করণ – ভাদ্র ১৪২২, পৃষ্ঠা ৭৯৭

৫৯. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'গদ্যসমগ্র', (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ৩৭১

৬০. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭২

৬১. দেব, চিত্রা : 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭, নবম মুদ্রণ – জুন ২০১৮, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১

৬২. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : ‘গদ্যসমগ্র’, (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – আগস্ট ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা ৪১৭

৬৩. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৯৯

৬৪. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৩

৬৫. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৩৩

৬৬. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৫

৬৭. তদেব : ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮২